শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হক

ভবেশ রায়

শেরেবাংলা

এ.কে ফজলুল হক

ভবেশ রায়

প্রকাশক

স্বপ্না নাথ

পাণ্ডুলিপি ৩৮/২খ, বাংলাবাজার

ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল পাণ্ডুলিপি সংস্করণ

জুন ১৯৯৫

দ্বিতীয় মুদ্রণ

নভেম্বর ২০০৪

প্রচ্ছদ

ধ্রুব এষ

১. গাজিপুর থেকে চাখার

সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা এই দেশ। ছায়ায় ঘেরা মায়ায় ভরা এদেশের জল মাটি আলো হাওয়াকে আমরা যেমন ভালবাসি, তেমনি ভালবাসি। এদেশের মানুষকেও ।

তবু কখনও কখনও এমন কিছু মানুষের জন্ম হয়, যাঁরা নিজের জন্মভূমিকে ভালবাসেন আরও নিবিড় করে, হয়তো একেবারে অন্যরকমভাবে। আর সেই অন্যরকমভাবে দেশকে—দেশের সাধারণ মানুষকে ভালবাসতে গিয়েই তারা নিজেরাও হয়ে ওঠেন এক ভিন্ন মানুষ। অসাধারণ মানুষ।

তখন তাঁদের নিয়েই লেখা হয় ইতিহাস। শতাব্দীর ইতিহাস হয়ে ওঠেন তেমন মানুষেরাই। ইতিহাসের পাতা তাঁদের নাম বুকে ধারণ করে নিজেকে ধন্য মনে করে।

এমনি এক মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন শেরেবাংলা আবুর কাশেম ফজলুল হক। তিনি এদেশের মাটিকে, মাটির মানুষকে এমন করে ভালবেসেছিলেন যেন গোটা দেশটাই ছিল তাঁর পরম আত্মীয়, আপনজন। তিনি ভালবেসেছিলেন এদেশের অতি সাধারণ মানুষকে। এদেশের কৃষক, শ্রমিক, কুলি, কামার, কুমার এরাই ছিল তাঁর পরম বন্ধু। তিনি ছিলেন তাদেরই নেতা।

কবি বেগম সুফিয়া কামাল এই মহান নেতাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন—

ইয়েমেনী বাদশা হাতেম তাঈ এর
শুনিয়াছি মোরা নাম
বাংলাদেশের হাতেম তাঈয়েরে
এ চোখে দেখিলাম
দেখিয়াছি সেই বাংলার শের এ!

দরাজ হস্তও দিল
যাঁর জুড়ি নেই, দুয়ারে তাঁহার
নিত্য এ মিছিল
ম্লান মুখ নিয়া আসিত শূন্য হাতে
ফিরিত হানিয়া শ্রদ্ধার সনে
বার বার পশ্চাতে
চাহিত ফিরিয়া, হেরিত তাঁহারে
যে ছিল ভরিয়া মুঠি
বিরাট বিশাল কায়া তাঁর
আর মমতায় ভরা দিঠি।

বাংলার এই হাতেমা তাঈ—জনদরদি বন্ধু শেরেবাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক জন্ম নিয়েছিলেন এদেশেরই মাটিতে।

বাংলাদেশের বরিশাল জেলার পিরোজপুর মহকুমার (বর্তমানে জেলা) নিভৃত একটি পল্লিগ্রাম। নাম চাখার। এই চাখারেরই বিখ্যাত কাজী পরিবারে ১৮৭৩ সালের ২৬ অক্টোবর (বাংলা ১২৮০ সনের ৯ কার্তিক) জন্মগ্রহণ করেন এই বিশাল পুরুষ।

ফজলুল হকের পিতা ছিলেন কাজী ওয়াজেদ আলী। বরিশাল সদর কোর্টের নামজাদা সরকারি উকিল ছিলেন তিনি। সম্ভ্রান্ত পরিবারের সম্মানী মানুষ। সবাই এক ডাকে চিনত তাঁকে।

শোনা যায়, শেরে বাংলা ফজলুল হকদের আদি বাস ছিল প্রাচীন ভারতের যুক্ত প্রদেশে (বর্তমান উত্তর প্রদেশ)। যুক্ত প্রদেশের গাজীপুর জেলায় ছিল তাঁর পূর্বপুরুষদের আদিনিবাস।

সেখান থেকেই তাঁর পূর্বপুরুষেরা ভাগ্যের আন্বেষণে এসেছিলেন তৎকালীন বঙ্গদেশে। জায়গাজমি কিনে প্রথমে বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন

পটুয়াখালি জেলার বিল বিলাস নামক স্থানে। বাংলাদেশের এটাই তাঁদের প্রথম বসতি হলেও স্থায়ী বাস হয়নি। শেরে বাংলার দাদা কাজী আকরম আলী এই বিল বিলাস গ্রামের বসতি তুলে দিয়ে বাড়ি নিলেন চাখারে।

শেরেবাংলার দাদা কাজী আকরম আলি ছিলেন মোক্তার। চাখার থেকেই তিনি প্রতিদিন বরিশাল শহরে এসে সদর কোর্টে মোক্তারি করতেন।

মোক্তার হলেও প্রচুর ছিল তাঁর আয়; প্রতিদিন তিনি উপার্জন করতেন অঢেল অর্থ। শুধু আয় নয়- যেমন ছিল আয়, তেমনি ছিল ব্যয়ও।

সারা অঞ্চলের গরিব-দুখদের জন্য ছিল তাঁর দুয়ার খোলা। কাজী সাহেবের বাড়িতে ছিল একটি লঙরখানা। গরিব-দুখিদের জন্য প্রতিদিন রান্না হত খাবার। দশজন, বিশজন, তিরিশজন। প্রতিদিনই লোকজন আসত, থাকত, খেয়ে যেত।

এই লঙরখানা চালাতেও ব্যয় হত প্রচুর অর্থ শোনা যায়, এই বিপুল খরচ চালাতে তাঁর মোক্তারির প্রচুর আয়েও অনেক সময় কুলাত না। ঋণ করতে হত। আর সেই ঋণের টাকা শোধ করতে না পেরে মাঝে মাঝেই দেনার দায়ে যেতে হত জেলে। এর জন্য অবশ্য তাঁর কোনো দুঃখ ছিল না। উৎসাহও কমে যেত না। তিনি জেলখান: থেকেই বাড়িতে পত্র লিখতেন- আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। এখানে ভালই আছি। এখানে একমনে আল্লাহকে ডাকবার অবকাশ পাচ্ছি। আমি শীঘ্রই বাড়ি আসছি। কিন্তু খবরদার, কোনো মেহমান যেন আমার লঙরখানা থেকে মিমুখ হয়ে ফিরে না যায় ওটা যেন ঠিকমতে চলে।

এমন একজন মহান ব্যক্তির ঘরেই জন্মগ্রহণ করেন শেরেবাংলার পিতা কাজী ওয়াজেদ আলি। তিনিও ছিলেন পিতার যোগ্য সন্তান; দীনদুখিদের প্রতি তাঁর ও ছিল অশেষ দয়া। বরিশালের লোকেরা তাঁকে ও ডাকত—‘গরিবের বন্ধু’ বলে। পিতার প্রতিষ্ঠিত সেই লঙরখানা তাঁর হাতে আরও বড় আকার ধারণ করে। তিনি যেমন ছিলেন দয়ালু, তেমনি ছিলেন বহু ভাষাবিদ। বড় বক্তাও

ছিলেন। ইংরেজি, বাংলা ও ফারসিতে অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারতেন কাজী ওয়াজেদ আলী।

২. শিক্ষাজীবন

এমনি এক ঐতিহ্যবাহী পরিবারের যোগ্য সন্তান হয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন শেরেবাংলা ফজলুল হক। পিতার অসাধারণ গুণের প্রায় পুরোটাই তিনি পেয়েছিলেন উত্তরাধিকারসূত্রে। বাল্যকালে শেরেবাংলা ছিলেন অসাধারণ মেধার অধিকারী।

প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় গাঁয়ের পাঠশালাতে। প্রথম যখন পাঠশালাতে ভর্তি হন, তখন তিনি ছিলেন একেবারেই নাবালক। মাত্র পাঁচ বছরের এক অবুঝ শিশু। কিন্তু তখনি ছিল তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি আর মেধা।

ফজলুল হকের সাথে একই শ্রেণীতে তখন আর দশ বারোজন ছেলেমেয়ে পড়ত। তারা সবাই তার চেয়ে এক দুবছরের বড়ই ছিল। কিন্তু তা হলে কী হবে? পড়া মুখস্থ করায় তার সাথে কেউ এঁটে উঠতে পারত না। পাঠশালার ওস্তাদ যে পড়াই পড়তে দিতেন বালক ফজলুল হক অমনি চট করে তা মুখস্থ করে ফেলতেন। আর ওস্তাদকে গিয়ে বলতেন, স্যার, পড়া হয়ে গেছে, এবার আরও বেশি করে পড়া দেন।

কাণ্ড দেখে ওস্তাদ অবাক হয়ে যেতেন। এইটুকু ছেলে এতখানি পড়া এত অল্প সময়ে মুখস্থ করে ফেলল! ওস্তাদ অবাক হয়ে বলতেন, তুমি তো চট করে মুখস্থ করে ফেলেছ, কিন্তু তোমার সাথে যারা আছে তারা তো পারেনি?

বালক ফজলুল হক বলেন, ওরা না পারলে আমি কী করব? ওদের জন্য কি আমি বসে থাকব? আমি একাই বইটা পড়ে শেষ করে ফেলব।

কিন্তু বই শেষ করার জন্য তোমার এত আগ্রহ কেন বাপু? ওস্তাদ বলতেন।

ফজলুল হক বলতেন, বাঃ রে! এ বইটা শেষ না করলে আব্বা নতুন বই কিনে দেবেন না যে! আমার যে আরও নতুন বই চাই। আর অনেক বই পড়তে চাই আমি।

লেখাপড়ার প্রতি এমনি ছিল তার আগ্রহ। ক্লাসে বরাবরই প্রথম স্থান অধিকার করতেন ফজলুল হক।

ক্লাসে যেমন ছিলেন ভাল ছাত্র, তেমনি খেলার মাঠে ও ছিলেন সেরা খেলোয়াড়। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই তিনি ছিলেন বাড়ন্ত গড়নের ছেলে। অল্পবয়সেই পিতামহ পিতার মতো ছিল তাঁর বিশাল বক্ষ, সুউচ্চ শির, শক্তিশালী দুটি হা েত আর দুটি পা।

গোল্লাছুট, লাঠিখেলা, কাবাডি খেলা আর পাঞ্জাকষায় তাঁর দাপটে কেউ দাঁড়াতে পারত না। গাঁয়ের ছেলেমেয়েদেরও তিনি সর্দার। সব কাজেই তাঁর মোড়লি করা চাইই। খেলার মাঠে হোক, পাশের বাড়ির বাগান থেকে নারকেল পেড়ে আনতে হা েক, তার সাথে পাল্লা দেয় এমন বুকের পাটা কারও ছিল না; কারও গাছের নারকেল পাড়তে উঠে একটা দুটো নয়, কম করে হলেও হালি দেড়েক হাতে না নিয়ে নামার ছেলে ফজলুল হক ছিলেন না।

নারকেল পেড়ে এনেই চুপিচুপি বসে পড়তেন পাশের বাগানের কোনো আড়ালে। কাছে দা নেই। না-ই থাকল। তাতে পরোয়া নেই। হাতের ঘুষি মেরেই তিনি দিব্যি দুচারটে নারকেলকে দুফাক করে দিতেন অনায়াসে। তারপর একাই সবগুলো নারকেলের পানি ঢগ ঢগ করে গলায় ঢেলে দিয়ে পরম তৃপ্তিতে ঢেকুর তুলে বলে উঠতেন,—শুকুর আল-হামদুলিল্লা।

ছেলেবেলায় শেরেবাংলার গায়ে যে অসীম শক্তি ছিল তা নিয়ে অনেক মজার মজার গল্প প্রচলিত আছে।

এমনি একটি ঘটনার কথা বলছি। তখন তিনি সবেমাত্র যৌবনে পা দিয়েছেন। সারাদেহে তখন বয়ে যাচ্ছে শক্তির জোয়ার।

এ সময় তাদের পাশেই থাকত এক কাবুলিওয়ালা। মাস্তবড় জোয়ান। গায়ে অসুরের শক্তি। পাঞ্জাকাষী খেলায় গাঁয়ের একটি যুবকও তাঁর সাথে এঁটে উঠতে পারছে না। মান ইজ্জতের প্রশ্ন। অবশেষে গাঁয়ের সব ছেলে মিলে এসে ধরল বীর জোয়ান ফজলুল হককে। এমন পরাজয়ের করুণ কাহিনী শুনে গায়ের রক্ত টগবগ করে উঠল তারও। কী! ফজলুল হকের দেহে প্রাণ থাকতে এমন অপমান? গর্জে উঠলেন তিনি, চল দেখি কে ব্যাটা পালোয়ান, কোথাকার কোন কাবলিওয়ালা ? গাঁয়ের ইজ্জত বলে কথা।

তারপর দলবল সাথে নিয়ে তিনি তক্ষুনি ছুটলেন কাবলিওয়ালার বাড়িতে। বাড়িয়ে দিলেন হাত। মুগুরের মতো শক্ত একখানি হাত।

—এসো দেখি, কার গায়ে কতো জোর হয়ে যাক পরীক্ষা।

কাবলি যুবকও তখন বাড়িয়ে দিল হাত! তারও মনে দারুণ সাহস। প্রচন্ড আত্মবিশ্বাস। যতই জোয়ান হোক, বাঙালির গায়ে আর কত শক্তি হবে? অমন কত জোয়ান নাস্তানাবুদ হয়ে গেল এর আগে! বাঙালিরা কষবে পাঞ্জা? ফোঃ!

শুরু হল তারপর পাঞ্জাকষী খেলা। কিন্তু মিনিট না যেতেই কাবলিওয়ালা দুচোখে দেখতে লাগল বঙ্গদেশেরই হলুদ-হলুদ সরষে ফুল। দুচোখ ঝাপসা হয়ে এল তার। ফজলুল হক সিংহ-বিক্রমে এমন প্রচণ্ডভাবে ওর আঙুল চেপে ধরলেন যে কাবলিওয়ালার আঙুল ফেটে রক্ত বের হতে লাগল। অসহ্য যন্ত্রণায় বেচারি মরণচিৎকার দিয়ে উঠল।

ওর করুণ অবস্থা দেখে অবশেষে হাত ছেড়ে দিলেন ফজলুল হক। কাবলি যুবক প্রাণ নিয়ে পালাতে পালাতে বলতে লাগল, "বাঙালি মে ভি কাবলি জোয়ান হ্যায়।"

শেরেবাংলা ফজলুল হকের অসীম দৈহিক শক্তির এমনি আরও অনেক মজাদার গল্প আছে।

আর একটি ঘটনার কথা বলছি। এটি অবশ্য আর অনেক পরের ঘটনা। তখন তিনি রাজনীতিতে ঢুকেছেন। সারা দেশের একজন নামজাদা নেতা। ১৯২১

সালের ঘটনা। বরিশাল টাউন হলে মিটিং হচ্ছে। ঝালকাটি মসজিদে ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের উপর গুলিবর্ষণ করেছে। তারই প্রতিবাদে সভা। প্রধান বক্তা শেরেবাংলা ফজলুল হক। প্রচণ্ড জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা করছেন তিনি। সেই উত্তেজনাময় মুহূর্তে তিনি বক্তৃতা দিতে দিতে সামনের টেবিলে এমন প্রচণ্ড জোরে মুষ্টাঘাত করলেন যে তাতে গোটা টেবিলটাই ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। এমনি শক্তি ছিল তাঁর কবজিতে।

কিন্তু যাকগে সে কথা, বলছিলাম ছেলেবেলার কাহিনী, তার শিক্ষাজীবনের শুরুর কথা।

গাঁয়ের পাঠশালার পড়া শেষ হলে কিছুদিন পরই পিতা কাজী ওয়াজেদ আলি সাহেব পুত্রকে নিয়ে এলেন নিজের কাছে। বরিশাল শহরে। বরিশাল সদর জিলা স্কুলে ভর্তি করালেন ছেলেকে।

শহরে এসেও পড়াশোনা চলল। সেইসাথে চলল স্কুলের ছেলেদের সর্দারি। সব কাজেই তার থাকা চাই। সব কাজেই তার দারুণ উৎসাহ। যে বিশাল ব্যক্তিত্ব একদা সারা বাংলাদেশের নেতৃত্বদান করেছিল, সারা বাংলার পথঘাট শহর বন্দর কাঁপিয়ে তুলেছিল, তার শুরু হয়েছিল এমনি করেই। ভবিষ্যতের মহীরুহের পরিচয় তাঁর বাল্যকালেই জানা গিয়েছিল। আর সেই জন্যই হয়তো কবি বলেছেন, ‘ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে শেরেবাংলার অন্তরেও একটি বিশাল ব্যক্তিত্ব লুকিয়ে ছিল।

ফজলুল হক ১৮৮৬ সালে মধ্য ইংরেজি পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করেন। তখন তিনি যে দস্তখত দিয়ে মাসিক বৃত্তির টাকা তুলতেন তার রশিদ এখনও বরিশাল জিলা স্কুলে আছে।

এরপর তিনি মাত্র ১৬ বছর বয়সে ১৮৮৯ সালে বরিশাল জিলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বিভিশনাল স্কলারশিপ লাভ করেন।

উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি এবার চললেন কলকাতা। কলকাতা তখন ছিল বাংলাদেশের রাজধানী। রাজধানী কলকাতায় নামকরা কলেজ ছিল প্রেসিডেন্সি কলেজ।

এই সুদূর রাজধানীতে এসেও কিন্তু স্বভাবের খুব একটা পরিবর্তন হল না ফজলুল হকের। পড়াশোনা ঠিকই চলল। আর সেইসাথে চলতে থাকল সর্দারিও। এই কলকাতা এসে ও ছেলেদের সর্দার হয়ে উঠলেন তিনি। খেলাধুলা, সংগঠন আর হাজারেও কাজ নিয়ে সারাদিন কোথায় কোথায় টো-টো করে ঘুরে বেড়ান তিনি। পড়াশোনার দিকে বড় একটা নজর নেই।

তখন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ছিলেন বাঘা বাঘা সব প্রফেসর।

ফজলুল হক এই কলেজে একই সাথে অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা আর রাসায়নশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে পড়ছেন। ক্লাসের সেরা ছাত্র ফজলুল হক। তার নাম সব স্যারের মুখে মুখে। স্যারেরা ক্লাসে ঢুকেই আগে তাকে খোঁজেন!

তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের ডাকসাইটে প্রফেসর ছিলেন মিঃ পি. সি. রায় (আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়)। তিনি পড়াতেন রসায়নশাস্ত্র। প্রফেসর রায় ফজলুল হককে অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন।

একবার ঘটল এক কান্ড। ক্রমাগত সাত দিন মিঃ রায় তাঁর প্রিয় ছাত্রকে ক্লাসে না পেয়ে ভারি চিন্তায় পড়ে গেলেন। ছেলেটা ক্লাসে আসছে না কেন? কোনো অসুখবিসুখ করেনি তো?

অবশেষে আটদিনের দিন তিনি নিজেই বের হলেন তার প্রিয় ছাত্রের খোঁজে। অনেক খুঁজে খুঁজে তিনি বেরও করলেন ছাত্রদের আস্তানা। কিন্তু ফজলুল হক তো আস্তানায়ও নেই।

এতদূর যখন এসেছেন, তখন দেখা না করেই-বা যান কেমন করে? অতঃপর বসে রইলেন তিনি প্রতীক্ষায়। কিন্তু প্রতীক্ষা তো আর সহজে শেষ হয় না।

অবশেষে প্রতীক্ষার শেষ হল। প্রায় ঘন্টাখানেক পরে কোথা থেকে ফজলুল হক হৈ হৈ রৈ রৈ করতে করতে সবাইকে নিয়ে এসে হাজির হলেন মেসে। কিন্তু নিজের ঘরে পা দিতে গিয়েই তো তার আক্কেল গুড়ুম। পথের পাশে সাপ দেখে আঁতকে ওঠার মতো করে সভয়ে পিছিয়ে এলেন তিনি। সর্বনাশ! ঘরে যে বসে আছেন স্বয়ং স্যার পি. সি. রায়।

তিনি চমকে উঠে স্যারকে জিজ্ঞেস করলেন, স্যার, আপনি এখানে?

ঠায় বসে থাকতে থাকতে স্যারের মেজাজও এতক্ষণে গরম হয়ে উঠেছিল। তিনি খানিকটা গম্ভীর কণ্ঠেই বললেন, আজ ছ-সাত দিন ধরে তোমার কোনো দেখা নেই, ক্লাসে যাও না। তা আজকাল কি কর-টর?

স্যারের এমন শুষ্ক কণ্ঠের কঠিন কথায় অন্তর কেঁপে উঠল ফজলুল হকের। সহসা কোনো উত্তর দিতে পারলেন না তিনি। অবশেষে বারতিনেক ঢোক গিলে চার বার হাত কচলে বললেন, স্যার, কখন এসেছেন?

স্যার পি. সি. রায় তেমনি শুষ্ককণ্ঠে উত্তর দিলেন, তোমার হিসেবে ঘন্টাখানেক, কিন্তু আমার হিসেবে ষাট মিনিট।

আর বেশিক্ষণ বসলেন না। স্যার পি. সি. রায়; প্রিয় ছাত্রের সাথে তালাপ ও জামাল না। যা দেখে গেলেন তা তার মনের দুশ্চিন্তাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। যাবার সময় তেমনি শুষ্ককণ্ঠে বলে গেলেন, একটু পড়াশোনায় মনোযোগ দিও। শুধু খেলা নিয়ে মেতে থাকলে চলে না।

বলা বাহুল্য, শুধু ছাত্রকে শাসন করেই মনে স্বস্তি পাচ্ছিলেন না মিঃ রায়। এমন একটি সোনার টুকরো প্রতিভা অবহেলা অযত্নে নষ্ট হয়ে যাক, এটা তিনি চাইছিলেন না। তাই তিনি সেদিনই বাসায় ফিরে ফজলুল হকের পিতাকে লিখলেন পত্র। পত্রে ছেলের পড়াশোনায় অবহেলার কথা জানিয়ে বললেন, “আপনার ছেলে পড়াশোনা ছেড়ে খেলায় মেতেছে।” মনে কতখানি দরদ থাকলে একজন কলেজের প্রফেসর তার ছাত্রের পিতাকে এমন করে পত্র দিতে পারেন!

আসলেও অনেকটা তা-ই হয়েছিল। সে সময় ফজলুল হকের ঘাড়ে চেপেছিল সত্যি এক নতুন খেলার নেশা। তিনি মেতে উঠেচিলেন দাবাখেলা নিয়ে। খেলাটা নতুন ধরেছিল তো, তাই নেশাটা একটু বেশি চেপেছিল।

এমনিতেও পড়াশোনার মতোই খেলাধুলাতেও দারুণ ঝোঁক ছিল ফজলুল হকের। গাঁয়ে থাকতে খেলতেন লাঠি খেলা, কাবাডি। কলেজে ভর্তি হয়ে শুরু করলেন ফুটবল, এবং ক্রিকেট খেলা। এমনকি সাঁতারেও সহজে তার সাথে কেউ পেরে উঠত না। পুরোপুরি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার আগমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন খেলাধুলার সাথে জড়িত ছিলেন।

তিনি একবার কলকাতার বিখ্যাত 'মোহামেডান স্পোর্টিং দলের সভাপতিও নির্বাচিত হয়েছিলেন।

খেলাধুলা আর হৈ-হুল্লোড় নিয়ে দিনরাত মেতে থাকলেও পড়াশোনায় কখনও পেছনে পড়েননি তিনি। খেলার মতো পড়াতেও ছিল তাঁর পারদর্শিতা। এই প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকেই তিনি ১৮৯১ সালে কৃতিত্বের সাথে বৃত্তিলাভ করে এফ. এ. পাশ করেন এবং এই কলেজ থেকেই অঙ্কশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র এই তিনটি বিষয়ে একই সাতে অনার্সসহ বি. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৪ সালে।

তারপর ১৮৯৫ সালের কথা। ফজলুল হক তখন ইংরেজিতে এম. এ. পরীক্ষা দেয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সামনেই পরীক্ষা। আর মাত্র ছমাস বাকি। আর ঘুরাঘুরি নয়, দাবাখেলা নয়। এবার ঘরে বসে মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করছেন তিনি। এমনি সময় একদিন ঘটল এক ঘটনা।

ফজলুল হক ঘরে বসে পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত। এমন সময় এলেন তাঁর এক বন্ধু, কী, অঙ্কের ভয়ে বুঝি ইংরেজী নিয়ে পরীক্ষা দিচ্ছ?

—তার মানে?

বইয়ের পাতা থেকে মুখ তুলে তাকালেন ফজলুল হক। চোখেমুখে তাঁর বিস্ময়, কী বলতে চাইছ তুমি?

আগত বন্ধুটি বললেন, মুসলমান ছাত্রদের তো একটা দুর্নামে আছে।

—কী দুর্নাম?

—তারা কোনো বুদ্ধিবৃত্তির ধারে কাছে নেই। তারা অঙ্কে ভয় পায়। অঙ্ক তাদের মাথায় ঢোকে না।

— কী বললে তুমি? মুসলমান ছেলেরা অংক দেখে ভয় পায়? শুনো সহসা যেন বাঘের মতো গর্জে উঠলেন ফজলুল হক।

নয়তো কী! আগত বন্ধুটি বললেন, অংক দেখে ভয় পাও বলেই তো শুধু মুখস্থ বিদ্যা দিয়ে ইংরেজিতে পরীক্ষা দিচ্ছ। যদি আঙ্ক নিয়ে পরীক্ষা দিতে পারতে তবে নাহয় বুঝতামা তোমার মাথার জোর।

—ঠিক আছে, তা-ই হবে। ফজলুল হক সজোরে নিজের টেবিলে মুষ্টাঘাত করে বলে উঠলেন, আমি অঙ্কেই পরীক্ষা দেব! মুসলমান ছেলেরাও যে অঙ্কে ভয় পায় না তা দেখিয়ে দেব।

যে কথা সেই কাজ। "মরদ কা বাত হাতিকা দাঁত"। তেজস্বী ফজলুল হক জেদ ধরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের স্পেশাল পারমিশন নিয়ে মাত্র ছমাসের প্রস্তুতিতেই অঙ্কে রেকর্ডসংখ্যক নম্বর পেয়ে এম. এ. পরীক্ষায় পাস করলেন। সকলকে তাক লাগিয়ে দিলেন।

৩. পেশাজীবী ফজলুল হক

১৮৯৭ সালে ডিস্টিংশনসহ বি. এল. পাস করলেন ফজলুল হক। মনীষী স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অধীনে কলকাতা হাইকোর্টে যোগদান করলেন। কর্মজীবনে এই প্রথম প্রবেশ। 'বাংলার বাঘ' নামে খ্যাত স্যার আশুতোষের তুলনায় বয়সে আর বিজ্ঞতায় শেরেবাংলা ছিলেন একেবারেই ছেলেমানুষ। কিন্তু তা হলে কী হবে? এই তরুণ প্রতিভাবান সহকারীকে তিনি প্রচন্ড স্নেহ করতেন। শেরেবাংলাও এই স্বনামধন্য মনীষীকে শ্রদ্ধা করতেন পিতার মতো।

শিক্ষাজীবন শেষ করে কর্মজীবনে প্রবেশের সাথে সাথেই শেরেবাংলার দাম্পত্য জীবনেরও শুরু হয়। এ সময়েই তিনি (১৮৯৭ সালে) নবাব আবদুল লতিফের পৌত্র নবাব সৈয়দ মোহাম্মদ আলির কন্যা খুরশিদ তালাত বেগমকে প্রথম বিয়ে করেন।

কিন্তু ফজলুল হকের এই প্রথমা স্ত্রী অবশ্য বেশি দিন জীবিত ছিলেন না। মাত্র দুটো কন্যাসন্তান জন্মদানের পরই খুরশিদ তালাত বেগমের অকালমৃত্যু ঘটে।

অকালে পত্নীবিয়োগ ঘটায় শেরেবাংলা খানিকটা মুষড়ে পড়লেন। মনটা দমে গেল।

সংসারে দেখা দিল বিশৃঙ্খলা। তখন বাধ্য হয়েই তিনি দ্বিতীয়বার বিয়ে করার জন্য মনঃস্থির করলেন এবং হুগলী জেলার অধিবাসী ও কলকাতায় বসবাসকারী জনাব ইবনে আহমদের মেয়ে বেগম জিনাতুন্নেসাকে পত্নীত্বে বরণ করলেন।

কিন্তু এ বিয়েও খুব সুখের হল না তার। কোনো সন্তানাদি হল না। এই নিঃসন্তান অবস্থায়ই বেগম জিনাতুন্নেসাও অকালে মৃত্যুবরণ করেন। এবার ফজলুল হক আরও ভেঙে পড়লেন। তার কোনো পুত্রসন্তান হল না। তা হলে উত্তরাধিকারী হবে কে? তার যে একটি পুত্রসন্তান চাই।

ভাবতে ভাবতেই কেটে গেল আরও বেশ কয়েকটি বছর। অবশেষে ১৯৪৩ সালে পুনরায় তিনি দারপরিগ্রহ করেন। তৃতীয়বারে তিনি ভারতের মীরাটের এক সম্ভ্রান্ত বংশীয় মহিলাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন।

দীর্ঘ তিন বছর ধরে ফজলুল হক স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে শিক্ষানবিশি করেছিলেন। তারপর ১৯০০ সালে স্বাধীনভাবে শুরু করলেন কলকাতা হাইকোর্টে আইনব্যবসা।

কলকাতা হাইকোর্টে ফজলুল হকের প্রথম মামলা ছিল একটি জটিল খুনের মামলা।একটি খুনের মামলায় আসামির ফাঁসির হুকুমের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল মামলা।

আসলে মামলাটি প্রথমে গিয়েছিল ফজলুল হকের পিতার কাছে। তিনি তখনও বরিশালের প্রথম শ্রেণীর একজন উকিল। মামলাটি প্রথমে তার কাছেই গিয়েছিল। কিন্তু মামলাটি তিনি হাতে নেননি। কেসের জটিলতা দেখে আর জয়ের আশা খুব ক্ষীণ বুঝতে পেরে তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও মক্কেলকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

মক্কেল নিরাশ হয়ে গিয়েছিল অন্য উকিলের কাছে। কিন্তু ফল খুব সুবিধার হল না। মামলায় মক্কেলের ফাঁসির রায় হল! এবার একান্ত নিরুপায় হয়ে মক্কেল কলকাতা গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল তরুণ আইনজীবী ফজলুল হকের কাছে।

সব শুনে কেসটি হাতে নিলেন ফজলুল হক। অধিক অর্থের লোভে নয়; একটি গরিব লোককে অনিবার্য আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি মামলাটি হাতে নিলেন। বলা বাহুল্য তাঁর জীবনে এটাই ছিল হাইকোর্টে প্রথম আপীল দায়ের।

কিন্তু জীবনের প্রথম প্রচেষ্টা তার বিফল হয়নি। তিনি মামলায় জয়ী হলেন।

অসাধারণ বাগ্মিতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জোরে সাওয়াল-জবাব করে তিনি আসামিকে অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে আনলেন; এই অভূতপূর্ব বিজয়ে চারদিকে পড়ে গেল জয়-জয়কার। পুত্রের এই বিজয়-সংবাদ শুনে পিতাও হলেন পরম তৃপ্ত। তিনি নিজের যোগ্য সন্তানকে অভিনন্দন জানিয়ে লিখলেন পত্র। এমনি করে ওকালতির প্রথম জীবনেই তিনি প্রমাণ করলেন- ‘তাঁর পিতার যেখানে শেষ, তার সেখানে কেবল শুরু’।

কলকাতায় শেরেবাংলার স্বাধীনভাবে আইনব্যবসা শুরু করার এক বছরের মধ্যেই তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। তাঁর পিতা কাজী ওয়াজেদ আলী ইন্তেকাল করেন ১৯০১ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি।

পিতার মৃত্যুর পর আর কলকাতা থাকা হল না শেরেবাংলার। তিনি ফিরে এলেন তাঁর নিজের শহরে। বরিশালে এসে তিনি নতুন করে শুরু করলেন আইনব্যবসা। অল্প দিনেই পাসার জমে উঠল এখানেও।

আসলে তিনি কোর্টে দাঁড়িয়ে আইনের মারপ্যাঁচের চেয়ে নিজের উপস্থিত বুদ্ধি আর আশ্চর্য কথার কুটকৌশলে প্রতিপক্ষকে এমন করে ঘায়েল করে ছাড়তেন যে তারা বুঝতেই পারত না কিছু। সর্বনাশ ঘটে যাবার আগমুহূর্তেও প্রতিপক্ষের সাক্ষীরা কিছু ধরতে পারত না। শেরেবাংলা কথার ভেলকিবাজি দেখিয়ে এমন করে পেটের সত্য তথ্য টেনে বের করে আনতেন যে, সাক্ষীরা টেরও পেত না কোথা দিযে তারা কেমন করে ফেঁসে যাচ্ছে। আসলে উপস্থিত বুদ্ধিই ছিল ফজলুল হকের মামলাজয়ের আসল চাবিকাঠি।

তিনি কেমন করে কোর্টে দাঁড়িয়ে প্রতিপক্ষের সাক্ষীদের বোকা বানিয়ে ছাড়তেন তা নিয়েও বেশ মজার মজার গল্প আছে।

বরিশাল জজকোর্ট। একটি খুনের ঘটনার আপীলের মামলা। শেরেবাংলা হলেন ফরিয়াদি পক্ষের উকিল । ফরিয়াদির বক্তব্য হল,— আসামি লাথি মেরে মৃতের দুপাশের পাঁজর ভেঙে দিয়েছে।

কিন্তু আসামি এ অভিযোগ অস্বীকার করছে। আসামি বলছে, না, সে তাকে খুন করেনি। লোকটা নিজেই খেজুরগাছের রস পাড়তে গিয়ে কোমরের দড়ি ছিড়ে পড়ে গিয়ে পাঁজরের হাড় ভেঙে মারা গেছে। এটা কোনো খুন নয়-নিছক দুর্ঘটনা। এ ছাড়া ফরিয়াদির পক্ষে তেমন জোরালো সাক্ষ্য-প্রমাণ ছিল না। ছিল না তেমন একজন উকিলও। তাই সে মামলায় হেরে গেল।

আসামি পেল খালাস।

অবশেষে হতাশ হয়ে ফরিয়াদি এসে ধরল শেরেবাংলাকে। সব শুনে তিনি মামলাটি হাতে নিলেন। কোর্টে পুনর্বিচারের প্রার্থনা করলেন।

শুনানির দিন শেরেবাংলা তাঁর মক্কেলকে ডেকে বললেন, শোনো মিয়া, কোর্টে আসার সময় দুটো জিনিস নিয়ে এসো।

—কি কি হুজুর? মক্কের শুধাল।

—একটি খেজুরগাছ কাটা দা, আর একগাছি দড়ি।

—ওসব দিয়ে কি হবে হুজুর? শেরে বাংলার কথা শুনে মক্কেল তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল ফ্যালফ্যাল করে।

শেরেবাংলা ধমক দিয়ে বললেন, ওসব জেনে তোমার কাজ নেই মিয়া। তোমাকে যা বলেছি তাই করো।

শুনানির দিন কথামতো সত্যি সত্যি ফিরিয়াদি খেজুরগাছ কাটা একখানা ধারালো দা আর দড়ি নিয়ে কোর্টে হাজির হল।

শেরেবাংলা কোর্টে সাওয়াল-জবাবের সময় হাকিমকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, মহামান্য আদালত, মনে করুন, ঘরে এই থামটাই একটা খেজুরগাছ। আর মনে করুন যে লোকটা মারা গেছে, সে এখনও জীবিত আছে। এখন মরা লোকটি কোমরে দড়ি বেঁধে গাছে উঠে গেল। তারপর একটু পর একপাশের দড়ি ছিড়ে লোকটা ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেল। ফলে লোকটার সেই পাশের কোমরের হাড়টা ভেঙে গেল। তারপর লোকটা দ্বিতীয়বার আবার গাছে উঠল এবং অন্য পাশের গাড়ি ছিঁড়ে আবার মাটিতে পড়ে গিয়ে অপর পাশের কোমরের হাড়ও ভেঙে গেল।

উকিল সাহেবের আজগুবি কথা শুনে তো হাকিমের দুচোখ বিস্ময়ে চড়কগাছের মাগডালে চড়ে গেল বলেন, কী! কী সব আজগুবি গল্প শোনাচ্ছেন?

—কেন? শেরে বাংলা এবার হাসতে লাগলেন।

—তা নয়তো কী? এক পাশের পাঁজর ভাঙা লোকটা ফের আবার গাছে উঠল কেমন করে? এটা কি সম্ভব?

এবার শেরেবাংলা সহাস্যে সবিনয়ে বললেন, হুজুর, সুবিজ্ঞ বিচারক। এমন ধরনের অসম্ভবকে সম্ভব করা হয়েছিল বলেই তো প্রথমবারের বিচারে আসামি খালাস পেয়েছিল।

মামলায় শেরেবাংলা জিতে গেলেন। এমনি উপস্থিত বুদ্ধির জোরে এমন বহু জটিল মামলাতেও দিব্যি জয়লাভ করেছেন তিনি।

বরিশালে এসে ওকালতি করার সময় তিনি কিছুদিন কলেজের অধ্যাপনাও করেছিলেন। তবে নামে চাকরি। বিনে বেতনের শৌখিন চাকরি যাকে বলে।

ওকালতি করার সময় হঠাৎ করে কলেজে বিনে বেতনের চাকরি নেয়ার পেছনেও ছিল একটি ঘটনা।

সেকালে বরিশালের স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন অশ্বিনীকুমার দত্ত। এই দত্তবাবুর বৈঠকখানাতেই সেদিন বিকেলে বসে আড্ডা দিচ্ছিলেন শেরেবাংলা। সেখানে আরও উপস্থিত ছিলেন নবপ্রতিষ্ঠিত রাজেন্দ্র কলেজের প্রিন্সিপাল ডঃ হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। আলোচনা হচ্ছিল নতুন কলেজটির নানা সমস্যা নিয়ে। হরেনবাবু আক্ষেপ করে বলছিলেন, নতুন কলেজটিকে নিয়ে রাতদিন একেবারে হিমশিম খাচ্ছি। সবচেয়ে বড় সমস্যা হল ভাল শিক্ষকের। একজন অঙ্কের প্রফেসর কোথাও পাচ্ছিনে। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিযেছি। কিন্তু তাতেও ফল হয়নি। একটাও দরখাস্ত পড়েনি।

কথাটা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন শেরেবাংলা। তারপর হেসে বলেন, হয়তো মোটা মাইনে দিতে চেয়েছেন বলেই কেউ আসছেন না। তা মাইনে নিয়ে যখন কেউ আসতে চাইছে না, তখন দেখুন বিনে পয়সায় কেউ আসে কি না।

ডঃ মুখার্জী বললেন, আপনি ঠাট্টা করছেন হক সাহেব? এমন কখনও হয় নাকি? যেখানে টাকা দিয়ে লোক পাওয়া যাচ্ছে না, সেখানে বিনে পয়সার কেউ আসবে?

—ঘটতেও তো পারে এমন ঘটনা।

—বেশ, তা-ই না হয় দেব। তিনি হেসে বললেন, বিনে পয়সার বিজ্ঞাপনই দেব এবার তা হলে।

—তা হলে একটা কথা বলি? শেরেবাংলা তেমনি হাসতে হাসতে বললেন, যদি আপনার আপত্তি না থাকে, যতদনি অঙ্কের অধ্যাপক পাওয়া না যায়, ততদিন আমিই ঠ্যাকা দিয়ে যাব।

— বলেন কি! আপনি চাকরি করবেন? কথা শুনে ডঃ মুখার্জী তো খুশিতে একেবারে জড়িয়ে ধরলেন ফজলুল হককে। কিন্তু আপনার তো কত কাজ! সারাদিনই ব্যস্ত থাকতে হয় মক্কেল নিয়ে। আপনি কি সময় করতে পারবেন?

—খুব পারব। ডঃ মুখার্জী। ফজলুল হক বললেন, আমার যত কাজই থাক, শিক্ষার উন্নয়নের দাবি সবার আগে।

শিক্ষা ও শিক্ষার উন্নয়নের প্রতি এমনি আগ্রহ ছিল শেরেবাংলার।

বরিশালের বি.এম. কলেজে অঙ্কের অধ্যাপন করার সাথে সাথে তিনি আরেকটি কাজ করেছিলেন। তিনি বরিশাল জিলা স্কুলে ফারসি ভাষার পরীক্ষকের কাজও নিয়েছিলেন। একই সময় চালিয়ে যেতেন দুটো কা্েজই।

শেরেবাংলার জীবনের সাথে যারা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন তাঁরাই বলেন, এই সময় থেকেই তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারারও সূচনা হয়। এ সময় থেকেই তিনি দেশ, সমাজ এবং দেশের রাজনৈতিক গতিধারা সম্পর্কে ভাবতে শুরু করেন।

আর তারই অঙ্কুরোদগম হয় ছোট্ট একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে। এ সময় তিনি স্থির করলেন একটি পত্রিকা বের করবেন। শিশু-কিশোরদের জন্য একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা— নাম হবে তার 'বালক'।

মনের ভেতরে বহুদিনের লুকিয়ে রাখা কথাটা তিনি একদিন বলেও ফেললেন একজনকে। বললেন, রাজেন্দ্র কলেজে প্রিন্সিপাল ডঃ মুখার্জীকে । ডঃ মুখার্জী ছিলেন আরও উৎসাহী মানুষ। শুনেই খুশি হয়ে তিনি বললেন, মনে মনে

যখন ঠিক করেই ফেলেছেন, তবে আর বিলম্ব করতে নেই। শুভ কাজ যত শীর্ঘ হয় ততই ভাল। শুভস্য শীঘ্রম।

তারপর ‘বালক’ একদিন সত্যি সত্যি আত্মপ্রকাশ করল। সম্পাদক হলেন ফজলুল হক নিজেই।

শুধু বালক নয়, পরের বছরই তিনি প্রকাশ করলেন আরও একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। ‘ভারত সুহৃদ’ নামে এ সাপ্তাহিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় ১৯০২ সালে। পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল ফজলুল হক এবং রায়বাহাদুর নিবারণচন্দ্রের যুগ সম্পাদনায়।

‘ভারত সুহৃদ' প্রকাশের মধ্য দিয়েই শেরেবাংলা রাজনীতি, সমাজনীতি ও দেশকাল সম্পর্কে আরও অনেকখানি সচেতন হয়ে পড়েন।

সেবার বরিশাল পৌরসভার নির্বাচন হবে। ফজলুল হক স্থির করলেন, তিনি ও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। যেমন ভাবা তেমন কাজ; সত্যি সত্যি তিনি নির্বাচনে দাঁড়ালেন এবং বিপুল ভোটে জয়ীও হলেন। আর এমনি করেই তাঁর জীবন ঘটল এফ বিরাট পট পরিবর্তন।

পৌরসভার নির্বাচনে জয়লাভ করে শেরেবাংলার উৎসাহ এবং সমাজ সেবার আকাঙ্ক্ষাও গেল বেড়ে।

এরপর তিনি প্রতিদ্বন্দিতা করলেন জেলা বোর্ডের নির্বাচনে এবং এটাতেও জয়লাভ করলেন। তাঁর জীবনে এল নতুন দিগ্‌দর্শন।

বেশি করে ঝুঁকে পড়লেন রাজনীতির প্রতি। যেন দেশ, সমাজ আর সমাজের অবেহেলিত ও লাঞ্ছিত মানুষগুলো তাঁকে দুহাত তুলে ডাকছিল, তিনি সেই ডাক শুনতে পাচ্ছিলেন; তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন দেশের কৃষক, শ্রমিক। আর ক্ষুধিত মানুষের ডাক। মে ডাকে তাঁর অন্তর ক্রমেই সাড়া দিচ্ছিল।

এরপর ১৯০৫ সালের ঘটনা; তখন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সর্ব্বভারতীয় মুসলিম সম্মেলন। এক মস্ত বড় ঐতিহাসিক সম্মেলন। সারা ভারতের মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা চলছে তখন।

ঢাকায় এই সম্মেলন অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা হলেন নবাব স্যার সলিমুল্লাহ। এই ঐতিহাসিক সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হবে। স্যার সলিমুল্লাহ ডেকে পাঠালেন ফজলুল হককে। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে জনাব এ. কে. ফজলুল হক এবং নবাব ভিকারউল, মুলককে যুগ সম্পাদক নির্বাচন করা হল। ভারতের মুসলিম ঐক্যের আন্দোলনে এমনি করে প্রথম শরিক হলেন শেরেবাংলা।

পরের বছর ১৯০৬ সালে লর্ড কার্জন প্রথমবার বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত করেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও আসামকে নিয়ে একটি নতুন প্রদেশ গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়। এই বঙ্গ ভঙ্গকে মুসলিম লীগ সমর্থন করে।

১৯০৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় আরও একটি ঐতিহাসিক সম্মেলন- ‘নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন’। এই সম্মেলনকেও সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য এবং এখানে গোটা ভারতের মুসলমানদের একত্রিত করার পেছনে ফজলুল হকেরই ছির সবচেয়ে বড় অবদান। এ উদ্দেশ্যেই তিনি সেদিন সারা ভারতে ছুটে বেড়িয়েছিলেন। এ সম্মেলনের সকল ব্যবস্থাও সুশৃঙ্খলভাবে তিনিই সম্পাদন করেছিলেন। সম্মেলনে যেসব প্রস্তাব নেয়া হয়েছিল তার ইংরেজি ও বাংলা খসড়াও করেছিলেন তিনিই। পরিচয় দিয়েছিলেন তাঁর বিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতার।

অন্য একটি কারণের জন্যও ঢাকার এই নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনটি ইতিহাসের পাতায় আজও বিখ্যাত হয়ে আছে। এই সম্মেলনেই (১৯০৬ সালে) প্রথম মুসলিম লীগের গোড়াপত্তন ঘটে।

তখন ফজলুল হকের বয়স মাত্র তেত্রিশ বছর। এ বছরেই তাঁর পেশাজীবনেও একটি পরিবর্তন ঘটে। তিনি ওকালতি ও অধ্যাপনার কাজ ছেড়ে যোগদান করেন সরকারি চাকরিতে। তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি গ্রহণ করেন।

এ চাকরিটিতে তিনি বহাল ছিলেন প্রায় পাঁচ বছর। কিছুদিন জামালপুর এবং কিছুদিন মাদারিপুরে থাকার পরে ১৯১১ সালে সরকার তাঁকে সমবায় বিভাগের সহকারী নিবন্ধকের পদে নিয়োগ করে।

তবে ততদিনে সরকারি চাকরির প্রতি মোহ কিছুটা কাটতে শুরু করেছে শেরেবাংলার। এমনভাবে সরকারি চাকরির একঘেয়ে জীবন আগে থেকেই ভাল লাগছিল না তাঁর। কারন সরকারি চাকরির সিঁড়ি ভেঙে গোলামির পদোন্নতি তো তাঁর জন্য নয়।

তদুপরি ওকালতির শিক্ষাজীবনের গুরু স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সেই তীব্র ভৎসনার কথা আজও তাঁর কানো বাজে। সর্ব্বক্ষণ যেন সেই গুরুগম্ভীর ব্যাঘ্র কণ্ঠটাই তাঁকে সগর্জনে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরির প্রথম দিকের কথা। একদিন তিনি গেলেন স্যার আশুতোষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য। একটি বিশেষ কাজ নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর কাছে।

ফজলুল হক ভেবেছিলেন নিশ্চয়ই স্যার এতদিন পরে তাঁকে দেখে খুব খুশি হবেন এবং আদর করে কাছে ডেকে কুশলবার্তা জিজ্ঞেস করবেন। কিন্তু ঘটনা ঘটল সম্পূর্ণ তার উল্টো।

এককালের এমন স্নেহধন্য পুত্রতুল্য শিষ্যের আগমনে আদৌ খুশি হলেন না স্যার আশুতোষ। ফজলুল হককে দেখেই তিনি শুষ্ক ও গভীর গলায় বললেন, কী ফজলু মিয়া, সরকারি চাকরি নিয়ে খুব আরামেই আছ বোধহয়?

—না স্যার, মোটেও নয়। ফজলুল হক বলতে লাগলেন, বড় একঘেয়ে কাজ। আর তার মধ্যেই কিনা সারাদিন ডুবে থাকতে হয়।

—গোলামির ওটাই তো সুখ; নির্ঝঞ্ঝাট দাসতু। তোমাকে কতবার খবর দিলাম চাকরিটা ছেড়ে দেবার জন্য। কিন্তু আমার কথা শুনলে না।

— কী করব। স্যার! মাস গেলেই অনেকগুলো...

আমতা-আমতা করে বলতে লাগলেন ফজলুল হক।

—অনেকগুলো টাকা, তাই না?

—তাই তো স্যার।

—না। আমি তোমার মুখ থেকে এসব শুনতে চাই না। সহসা স্যার আশুতোষ যেন বাঘের মতো গর্জন করে উঠলেন, তোমাদের মতো ছেলেরা এমন সস্তাদরে বিক্রি হয়ে যাক, এটা আমি আশা করতে পারিনে! তুমি কি বুঝতে পার না, পরাধীন এই দেশের কোটি কোটি মানুষ মুক্তির আশায় তোমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে?

—কিন্তু স্যার...।

—কিন্তু আবার কী? কালই ওই গোলামির শিকল ছিড়ে ফেলে চলে এসো। হাইকোর্টে এসে যোগদান করো। যতদিন পশার জমাতে না পারে, ততদিন দরকার হলে আমি তোমাকে চালাব।

বলতে বলতে স্যার আশুতোষের মুখখানা আরও গভীর হয়ে গেল, গোলামির শিকল যদি ছিড়তে না পার, তবে এ বাড়ির আঙিনায় আর কোনোদিন পা ফেলতে এসো না। আমি মনে করব যে- ফজলুল হককে আমি চিনতাম, সে মারা গেছে।

এই এতদিন পরেও স্যারের সেই তীব্র তিরষ্কারের সুরটা কানে বাজে। মনে পড়লে অস্বস্তিবোধ করেন। তবু মনে হয় সরকারি চাকরির এই উচ্চপদ আর অর্থের লোভ তাঁকে অন্তত কিছু দিনের জন্য হলেও মোহগ্রস্ত করে ফেলেছিল। কিন্তু বেশি দিন পারল না। অবশেষে এল সেই মুক্তির দিন।

১৯১১ সালের ঘটনা।

তখন তিনি সমবায় বিভাগের সহকারী নিবন্ধক। এই বিভাগেরই নিবন্ধক মিঃ কে. সি, দে আই. সি. এস, অন্য বিভাগে বদলি হয়ে গেলে তাঁর পদটি খালি হয়। শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক থেকে ফজলুল হকই ছিলেন পদটির যোগ্য দাবিদার। কিন্তু তিনি পেলেন না। শুধু সিনিয়রিটির কারণেই তাঁকে বাদ দিয়ে সে পদে নিয়োগ করা হল রায়বাহাদুর যামিনীকান্ত মিত্রকে।

এই ঘটনা ফজলুল হকের আত্মসম্মানে প্রচন্ড আঘাত করল— আর নয়, অনেক হয়েছে। এবার মুক্তি চাই।

সেদিন তিনি অফিসছুটির অনেক আগেই ফিরে এলেন ঘরে। চোখমুখ গভীর। স্বামীকে অমন বিষণ্নবদনে অসময়ে ঘরে ফিরতে দেখে বিবিসাহেবও গেলেন ভড়কে।

—ওকী? কী হয়েছে তোমার? মুখখানা অমন গম্ভীর কেন? এত সকালেই বাসায় এলে যা? অফিস তো এখান ছুটি হয়নি!

ফজলুল হক স্ত্রীর এতগুলো প্রশ্নের একটারও কোনো উত্তর দিলেন না। শুধু বললেন, আগে এককাপ চা দাও, তারপর বলছি।

বিবিসাহেব ছুটে গেলেন চা বানাতে। তারপর ধূমায়িত চায়ের কাপ স্বামীর সামনে নামিয়ে দিয়ে তেমনি উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধালেন, এবার বলো কী হয়েছে?

এবারও ফজলুল হক কোনো উত্তর দিলেন না। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ওটা নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালেন।

বারান্দায় খাঁচার ভেতর ছিল একটি পোষা ময়না পাখি। তিনি খাঁচা খুলে পাখিটাকে বের করে আনলেন। হাত বুলিয়ে আদর করলেন। তারপর উড়িয়ে দিলেন আকাশে। পাখি ডানা মেলে উড়ে গেল উন্মুক্ত আকাশের বুকে।

স্বামীর কাণ্ড দেখেতে হা-হা করতে করতে ছুটে এলেন বিবিসাহেব।

—একী করলে তুমি! পাখিটাকে ছেড়ে দিলে?

—দিলাম। পাখিটা আজ থেকে স্বাধীন। ওর গোলামির দিন শেষ হয়ে গেল। আর আমার ও গোলামির আজ থেকেই শেষ! পাখিটার মতো আমিও আজ স্বাধীন।

স্বামীর কথা কিছুই বুঝতে না পেরে বিবিসাহেব বললেন, এসব কী বলছি তুমি?

—আমি ঠিকই বলছি। সরকারি চাকরিটা ছেড়ে দিলাম। ভেবে দেখলাম, সরকারি চাকরির গোলামি আমার পোষাবে না। আমি আজ স্বাধীন। মুক্ত। পাখিটার মতো স্বাধীন।

এর পর থেকেই শুরু হল শেরেবাংলার পরিপূর্ণ রাজনৈতিক জীবন। রাজনীতির সাথে একেবারে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়লেন তিনি।

১৯১৩ সালে। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার (Legislative Council) নির্বাচন হবে। ফজলুল হক দাঁড়ালেন ঢাকা বিভাগীয় একটি কেন্দ্র থেকে। এই কেন্দ্রে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন প্রবল প্রতাপশালী জমিদার রায়বাহাদুর কুমার মহেন্দ্রনাথ মিত্র।

যখনকার কথা তখন দেশের সবাই কিন্তু ভোট দিতে পারত না। নাগরিকমাত্রেরই ভোটাধিকার ছিল না। দেশের নাগরিক হলেও শুধুমাত্র যাদের সম্পত্তি আছে এবং / জমিদারকে খাজনা দেয়, তাদেরই শুধু ভোটাধিকার ছিল। এর ফলে স্বাভাবিক কারণেই হিন্দু ভোটারের সংখ্যা বেশি ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিপুল জনপ্রিয়তার কারণে আমন প্রতাপশালী জমিদারকেও বিপুল ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করলেন তিনি। নির্বাচিত হলেন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য। রাজনৈতিক জীবনের শুরুতেই শেরেবাংলা দেশের হিন্দু-মুসলমান সকলের কাছে কতটা জনপ্রিয় ছিলেন এই নির্বাচন তারই প্রমাণ।

নির্বাচিত সদস্য হিসেবে শেরেবাংলার এই-ই প্রথম আইন পরিষদে প্রবেশ। নতুন সদস্য তিনি! তবু পরিষদে প্রথম দিনেই যে তথ্যপূর্ণ ও জ্বালাময়ী ভাষণ রেখেছিলেন, তাতে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন উপস্থিত সকল সদস্য। মুগ্ধ হয়েছিলেন বাংলার লাট স্বয়ং কারমাইকেলও। তিনি শেরেবাংলার বাগ্মিতার অপূর্ব দক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে নিজের সভাপতির উচ্চাসন থেকে নেমে এসে তাঁর সাথে করমর্দন করেছিলেন। তাঁকে জানিয়েছিলেন অভিনন্দন।

এ বছরই তিনি মুসলিম লীগেরও সদস্যপদ লাভ করেন। তখন বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন নবাব স্যার সলিমুল্লাহ। আর ফজলুল হক নির্বাচিত হলেন সাধারণ সম্পাদক। এ ছাড়াও তিনি একই সময়ে নিখিল ভারত মুসলিম লীগেরও যুগ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

শেরে বাংলার এই মুসলিম লীগে যোগদান বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। গুরুত্বপূর্ণ নানা দিক থেকেই।

ফজলুল হকের রাজনীতিতে আসার আগে পর্যন্ত বাংলাদেশের মুসলমান সমাজের যারা নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, তাদের কারও কারও জন্ম বাংলাদেশে হলেও তাঁরা প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙালি ছিলেন না। তাঁদের মাতৃভাষাও বাংলা ছিল না। এমনকি অনেকে নিজেদের বাঙালি বলে পরিচয় দিতেও দ্বিধাবোধ করতেন।

যেমন—নবাব স্যার সলিমুল্লাহ, সৈয়দ আমির আলি, নওয়াব আলি চৌধুরী —এঁরা সবাই ছিলেন উর্দুভাষী এবং অভিজাত পরিবারের মানুষ। দেশের সাধারণ মানুষের সাথে এদের পরিচয় প্রায় ছিল না বললেই চলে।

সেদিক থেকে শেরেবাংলাই ছিলেন মুসলিম লীগে সাধারণ মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি— তাদের আপন মানুষ।

মুসলিম লীগে যোগদান করার পর থেকেই তাঁর একমাত্র কাজ হল ব্রিটিশরাজের অনুগত জমিদার, নওয়াব ও কায়েমি স্বার্থবাদীদের হাত থেকে দেশের সাধারণ মানুষকে মুক্ত করা। এই রাজনৈতিক সংগ্রামের মাধ্যমেই দেশের অবহেলিত বঞ্চিত কৃষক-শ্রমিকের স্বার্থরক্ষা করা।

১৯১৪ সাল থেকেই শেরেবাংলা দেশের অত্যাচারী মহাজন ও জমিদারশ্রেণীর বিরুদ্ধে শুরু করেন তাঁর রাজনৈতিক সংগ্রাম। তারই পদক্ষেপ হিসেবে জামালপুরে অনুষ্ঠিত হয় কৃষক প্রজা সাধারণ সম্মেলন। শেরেবাংলার নির্দেশে জামালপুর (বর্তমানে জেলা) মহকুমার কুমার চরে এই ঐতিহাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। তৎকালীন বিশিষ্ট নেতা খোশ মোহাম্মদ চৌধুরী।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন দেশের কৃষক প্রজাগণের প্রাণপ্রিয় নেতা শেরেবাংলা ফজলুল হক। এই সম্মেলনে তাঁর উদাত্ত আহ্বানে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে দেশের সাধারণ প্রজাদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি হয় এবং এই আন্দোলন অল্পদিনের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে।

শেরে বাংলার নেতৃত্ত্বে পরের বছরই (১৯১৫ সাল) গঠিত হয় নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি। উল্লেখ্য যে, এই নিখিল প্রজা সমিতিই পরবর্তীকালে দেশের জমিদার ও মহাজন-শ্রেণীর বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করে।

জমিদার মহাজনদের বিরুদ্ধে এই যে আন্দোলন, এই আন্দোলন গড়ে তোলার প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন নিজের জীবনেরই বহু প্রত্যক্ষ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে। তিনি নিজের চাোখেই দেখেছিলেন এদেশের নিঃস্ব কৃষক প্রজা অত্যাচারী লোভী মহাজনদের হাতে কী ভাবে নিপীড়িত ও নিগৃহীত হচ্ছিল দিনের পর দিন।

যে দৃশ্য তিনি দেখেছিলেন, যে দৃশ্যের কথা তাঁর কোমল অন্তরকে ব্যথিত করে তুলত বারবার, তেমনি একটি ঘটনা ঘটেছিল তাঁর নিজ অঞ্চল চাখারেই।

তখনও ফজলুল হকের কর্মজীবনের প্রারম্ভিক কাল। তিনি তখন বরিশাল শহরেই ওকালতি করছেন।

সেদিন ঘোড়ার গাড়িদে চড়ে বরিশাল শহর থেকে ফিরছিলেন নিজের বাড়িতে চাখারে। গাঁয়ের পথ ধরে চলছিল গাড়ি। এমনি সময় পাশের একটি বাড়ি থেকে ভেসে এল এক শিশুর করুণ আর্তচিৎকার – না, না, আমি আমার পান্তার থালা দিমু না।

চিৎকার শুনে গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়লেন ফজলুল হক। এগিয়ে গেলেন। সেই বাড়ি নামের পর্ণকুটিরের দিকে।

ওটা ছিল গাঁয়ের নিঃস্ব ভূমিহীন চাষি ফরিদ আলির বাড়ি; গোলমালটা তার বাড়িতেই হচ্ছিল।

একেবারেই গরিব চাষি ফরিদ আলি। বাড়িতে দুটো ভাঙাচোরা শনের ঘর। এই অর্ধেক খসে পড়া শনের ঘর দুটোর একটায় থাকে। ফরিদ আলি সপরিবারে আর অপরটিতে থাকে তারই আদরের পোষা ছাগল তার দুটি বাচ্চা নিয়ে। ফরিদ আলির পরিবারে আছে স্ত্রী আর সাত বছরের ছেলে কেরামত আলি।

হক সাহেব সে আর্তচিৎকারটা শুনেছিলেন সেই কেরামত আলিরই।

গাঁয়ের ধনী মহাজন রজহম সরকার দেনার দায়ে ফরিদ আলির বাড়িঘর সব নিলাম করে নিয়েছে। আজ এসেছে দখল করতে। গাঁয়ের সব লোক ভেঙে পড়েছে ফরিদ আলির আঙিনায়। কেউ তামাশা দেখছে, কেউ দুঃখ করছে, আহা উহহু করছে।

ঘটনা যা জানা গেল তা হল— আগে ফরিদ আলির জমাজমি ছিল বিঘা সাতেক। কিন্তু দেনার দায়ে সবই আজ একে একে গেছে মহাজন রহিম সরকারের পেটে।

এখন নিঃস্ব ফরিদ আলি পরের বাড়িতে দিনমজুর খেটে খায়। কিন্তু মহাজনের অদৃশ্য করসাজিতে বোকা ফরিদের দেনা তবু শেষ হয়নি। তাই মহাজন নিয়েছে তার যথাসর্বস্ত লুট করে। আজ তার দখল।

হক সাহেব দেখলেন, ইতোমধ্যেই ফরিদ আলির একমাত্র বিত্তবেসাদ বাচ্চাসহ ছাগলটির দড়ি হস্তগত করে নিয়েছে মহাজন রহিম সরকার। ঘরে দুটো কাঁসার বাসন ছিল তাও মহাজনের করতলগত। তবে ফ্যাসাদ বেধেছে ছেলেটার পান্তাভাত খাবার থালাটার দখল নিয়ে। ওটা কিছুতেই দেবে না কেরামত আলি। থালাটা বুকে চেপে ধরে তারস্বরে চিৎকার করেছে —'না, না, আমার পান্তাভাতের থালাটা আমি দিমু না।'

কিন্তু নির্দয় মহাজনের মত তাতে হলল না। মহাজন সক্রোধে কেরামতের হাত থেকে থালাটা ছিনিয়ে নিল। ছেলেটা ধুলায় পড়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগল।

হক সাহেব। আর সহ্য করতে পারলেন না; এগিয়ে গিয়ে মহাজনকে বললেন, আচ্ছা ভাইসাহেব, ও থালাটার দাম ক'ত? বড় জোর দু-তিন টাকা? এই নিন। পাঁচ টাকা। থালাটা ছেলেটাকে ফিরিয়ে দিন।

হক সাহেব থালাটা উদ্ধার করে ছেলেটার হাতে ফিরিয়ে দিতে দিতে সস্নেহে বললেন, নে বাবা, নে। এই তোর পান্তাভাতের থালা নে।

কেরামত আলি থালাটা ফেরত পেয়ে খানিকক্ষণ হক সাহেবের মুখের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল, তারপর ওটা বুকে চেপে ধরে দৌড়ে ঢুকাল ঘরের ভিতর। কে জানে, আবার যদি কেউ কেড়ে নিতে আসে।

এরপর হক সাহেব বাকি টাকা দিয়ে ফরিদ আলির অন্যান্য জিনিস এবং ছাগলটাকেও ছাড়িয়ে দিলেন। তারপর ফিরে এলেন নিজের গাড়িতে।

পেছনে অবাক বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল ফরিদ আলি, তার বউ আর উপস্থিত গাঁয়ের শ'খানেক লোক। ওরা ভেবেই পেল না, লোকটা কি সত্যি সত্যি মানুষ, না। আল্লার কোনো ফেরেস্তা।

গাড়িতে ফিরে এসে একটা কথাও বলতে পারলেন না। তিনি। সারাটা পথ নিরবেই চলে এলেন। চাখার এসে গাড়োঁয়ানের ডাকে তাঁর ধ্যান ভাি৺গল। গাড়ি থেকে নামতে নামতে শেরেবাংলা তাঁর সাথিকে বললেন, আজকের যঠনাটা আমার জীবনে এক নতুন পথনির্দেশের কাজ করল। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যতদিন আমি এই মহাজনের কেড়ে নেয়া পান্তা ভাতের থালাগুলো ফেরত আনতে না পরব, ততদিন আমার সংগ্রাম শেষ হবে না। ওই নিঃস্ব প্রজাদের পান্তাভাতের থালাগুলো আজ থেকে আমার। ও থালা আমি কিছুতেই কেড়ে নিতে দেব না।

শেরেবাংলা তাঁর এই প্রতিজ্ঞায় সারা জীবন ধরেই অটল ছিলেন; পরবর্তীকালে ঋণ সালিশি বোর্ড! গঠন করে মহাজনদের হাত থেকে সত্যি সত্যি মুক্ত করেছিলেন বাংলাদেশের নিঃস্ব প্রজাদের। মহাজনের কোপদৃষ্টি থেকে রক্ষা করেছিলেন কেরামত আলিদের পান্তাভাতের থালা।

১৯১৪ সালেই শরু হয় প্রথম মহাযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ; আর এদিকে শুরু হয় নিখিল ভারত মুসলিম লীগ আর বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের মধ্যে দ্বন্দ্ব। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্যও আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে লাগলেন শেরেবাংলা। এই উদ্দেশ্যেই ১৩ এপ্রিল (১৯১৪ সাল) ঢাকায় ডাকা হল বঙ্গীয় প্রদেশিক মুসলিম লীগের সম্মেলন। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন শেরেবাংলা ফজলুল হক!

তিনি জাতীয় জীবনের এই সংকটময় মুহূর্তে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের সাথে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পদ ও সংহতি অক্ষুন্ন রাখার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেন—

'—যে ঢাকা নগরীর বুকে দাঁড়িয়ে আজ আমি আপনাদের সম্মুখে বক্তৃতা করছি, সেই ঢাকা নগরীতেই মুসলিম লীগের জন্ম, কাজেই আমাদের রাজনৈতিক কার্যক্রমকে বানচাল করে দিয়ে ভারতের কোটি কোটি মুসলমানের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগের প্রতি মারাত্মক আঘাত হানতে পারে, এমন কোন সিদ্ধান্ত যদি আজকে ঐতিহাসিক ঢাকা নগরীর বুকেই গ্রহণ করা হয়, তবে আমার বিচারে এর চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক আর কিছুই হতে পারে না। অবশ্যি এ কথাও আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে, মূল উদ্দেশ্য ও আদর্শের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও ব্যাপক ও সম্প্রসারিত করতে হবে। চোখ বন্ধ করে শুধু গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখার কোন অর্থ হয় না। বাস্তবতার সাথে গভীর সংযোগ রক্ষা করে অভীষ্ট সাধনের পথে আমাদের সীমাহীন বাধা বিপত্তির বিরুদ্ধে আপোষহীন মনোভাব নিয়ে বড়াই করতে হবে। রাজনৈতিক অভীষ্ট সাধন না করা পর্যন্ত আমাদের গতি হবে উদ্দাম ও অপ্রতিহত।'

শেরেবাংলার এই আহ্বান পরিপূর্ণভাবে ফলপ্রসূ হয়। মুসলিম লীগের ভাঙন রোধ হয়।

শিক্ষাবিস্তারের প্রতি ছিল শেরেবাংলার সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য শিক্ষা আন্দোলনের যে-কোনো কার্যক্রমের প্রতি তাঁর ছিল অকুণ্ঠ সমর্থন। তার চেষ্টাতেই ১৯১৬ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় দুটি ছাত্রাবাস— 'টেইলর হোস্টেল' ও 'কারমাইকেল হোস্টেল'।

এ বছরই বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগেরও সভাপতি নির্বাচিত হন।

এ বছরেরই শেষের দিকে অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসে ভারতের লখনউ শহরে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের একটি যুক্ত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই ঐতিহাসিক সম্মেলনেই হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রতীক 'লখনও-চুক্তি' গৃহীত হয়।

অন্যায়, অবিচার, ধর্মীর্ণয় কুসংস্কার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে শেরেবাংলার সংগ্রামমুখর জীবনে যতগুলো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল 'এপিফেনি' পত্রিকার একটি মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

ঘটনাটা ১৯১৭ সালের । এক ইংরেজ পাদ্রা এপিফেনি নামে একটি পত্রিকায় হযরত মুহম্মদ (দঃ)-এর চরিত্র সম্পর্কে কিছু অপত্তিকর মন্তব্য প্রকাশ করেন। এই নিয়ে সারা ভারতবর্ষের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মধ্যে বয়ে যায় প্রতিবাদের ঝড়। মার্শাল ল' উপেক্ষা করেই সুসলমানগণ নেমে পড়ে মিছিল করে।

তখন বাংলার গভর্নর ছিলেন লর্ড কারমাইকেল। উপায়ান্তর না দেখে এই উন্মত্ত জনতাকে শান্ত করার জন্য তিনি ডাকলেন শেরেবাংলা ফজলুল হককে। শেরেবাংলা ও রাজি হলেন আলোচনায়। এটার একটা সুঠু মীমাংসা হাে‌ক তিনিও তা চাইছিলেন।

কিন্তু এই আলোচনা চলাকালেই ঘটল আর দুর্ঘটনা। ইংরেজ সৈন্যদের গুলিতে কলকাতার জাকারিয়া স্ট্রীটের মাটি হল লাল। এই সংবাদ শুনেই শেরেবাংলা সাথে সাথে লর্ড কারমাইকেলকে বললেন, ‘মীমাংসা আলোচনা সত্ত্বেও যদি গুলিই চলবে, তবে আর আলোচনার কোনোই অর্থ নেই। আর যদি আপনি এমনি নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চালাতেই থাকেন, তবে আমি খালিহাতেই তার মোকাবেলা করব। অতএব আপনি আপনার পথ দেখুন, আমি আমার পথ দেখব।’

এই কথা বলেই তিনি সেই আলোচনার বৈঠক থেকেই পাগলের মতো সোজা ছুটে এলেন জাকারিয়া স্ট্রীটের দিকে। দেখলেন শতশত মুসলমান আহত ও নিহত হয়েছে। লাখো লাখো বিক্ষুব্ধ মানুষের দিকে তাক করে আছে অত্যাচারী ব্রিটিশ সৈন্যের হিংস্র কামান।

তিনি সক্রোধে সিংহের মতো গর্জন করে মুহূর্তে কামানের সামনে তার বিশাল বক্ষ পেতে দিয়ে বলতে লাগলেন, ‘‘আমার বক্ষ ভেদ না করে আর

একজন মুসলমানের গায়েও গুলি লাগতে দেব না। তোমরা আমার বুকে গুলি করো। ব্রিটিশের রাজস্ব আজ এখানেই খতম হয়ে যাক।'

লর্ড কারমাইকেল তখন আর উপায় না দেখে শেষে মীমাংসার প্রস্তাব দিয়ে শেরেবাংলার কাছে আবার পাঠালেন প্রতিনিধি।

লর্ড কারমাইকেল এবার যে মীমাংসার প্রস্তাবগুলো পাঠিয়েছিলেন সেগুলো হল—

ক. সরকার আহতদের পরিবারবর্গের ভরণপোষণ এবং তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

খ. এই আন্দোলনে বন্দিদের মুক্তি দেয়া হবে।

গ. 'এপিফেনি'র যাবতীয় আপত্তিকর সংখ্যা বাজেয়াপ্ত করা হবে।

ঘ. সরকার এক ঘন্টা সময়ের মধ্যে আপত্তিকর প্রবন্ধের লেখক এবং প্রকাশক পাদ্রী সাহেবকে লন্ডনগামী জাহাজে বিলেতে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবেন।

প্রস্তাব শুনে শান্ত হলেন শেরেবাংলা। তিনি লাটের প্রতিনিধি প্রধান সচিবকে বললেন, যদি প্রস্তাব অবিলম্বে কার্যকর করা হয় তবে জনতাকে শান্ত করা যাবে। প্রধান সচিব রাজি হলেন সরকার মীমাংসার প্রস্তাব দ্রুত বাস্তবায়নে মত দিল।

তখন শেরেবাংলাও বিক্ষুব্ধ জনসমুদ্রকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন, আপনারা যার যার ঘরে চলে যান, নিহতদের ক্ষতিপূরণ পাবেন। আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা হচ্ছে। বন্দিদের মুক্ত করে দেয়া হচ্ছে। এপিফেনির আপত্তিকর সংখ্যা বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে। পাদ্রীকে লন্ডনে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

এক ঘন্টার মধ্যে দাবি কার্যকর হলে জনতা শান্ত হল।

এমনি ছিল ভারতীয় প্রেস অ্যাক্ট (Indian Press Act) এর ঘটনাটিও। সাম্রাজ্যবাদীও স্বৈরাচারী ব্রিটিশ সরকার তৎকালীন ভারতের সংবাদপত্রসমূহের কণ্ঠরোধ করার উদ্দেশ্যেই ১৯১৭ সালে ভারতীয় প্রেস অ্যাক্ট নামে এই কুখ্যাত

আইনটি পাস করে। অবশ্য এই আইনটির খসড়া তৈরি হয়েছিল আরও অনেক আগেই ১৯১০ সালে। ১৯১৭ সালে তা আইন সভায় তুলে আইনে পরিণত করার ষড়যন্ত্র আঁটা হয়।

এই কুখ্যাত আইনের বিরুদ্ধেও সারা ভারতে উঠল প্রতিবাদের ঝড়। তারপর ১৯১৭ সালের ডিসেম্বরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বত্রিশতম অধিবেশনে মিঃ বি. জি. হ্যারিম্যান এই কুখ্যাত আইনটি বাতিলের দাবিতে প্রস্তাব আনেন। উল্লেখ্য যে, এই বি, জি. হ্যারিম্যান সাহেব নিজেও ছিলেন একজন সাংবাদিক। বোম্বাই-ক্রনিক্যাল পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তিনি। শেরেবাংলা হ্যারিম্যানের এই প্রস্তাব সমর্থন করে উক্ত অধিবেশনেই দিলেন এক গুরুগম্ভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ ভাষণ।

তিনি দাঁড়িয়ে তাঁর স্বভাবসুলভ গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বললেন, লাখো জনতার কণ্ঠের বজ্র আওয়াজকে রুখতে পারে দুনিয়ায় আজ পর্যন্ত এমন কোনো শক্তি জন্মলাভ করেছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। নির্যাতন ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা সামুষের স্বভাব, নিঃসংকোচে স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করতে চাওয়া তার জাগ্রত অধিকার এবং নির্যাতন ও নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোই মানবিক ধর্ম।...আমি আশা করছি ব্রিটিশ শাসকবর্গ সময় থাকতেই সাবধান হবেন এবং অবিলম্বে আইনের পুস্তক থেকে দমনমূলক 'প্রেস অ্যাক্ট' অপসারিত করবেন।

১৯১৮ সালে শেরেবাংলা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। কিন্তু তিনি ছিলেন মূলত মুসলীম লীগের নেতা। কিন্তু তখন এই নিয়ম ছিল একই ব্যক্তি ইচ্ছে করলে একই সময়ে মুসলীম লীগ ও কংগ্রেস উভয় দলেই সদস্যপদ নিতে পারতেন। শেরেবাংলা ও তা-ই ছিলেন।

তিনি একাধারে ছিলেন মুসলিম লীগের সভাপতি এবং সেই একই সময়ে ছিলেন নিখিল ভারত কংগ্রেসেরও সেক্রেটারি। সে বছরই তিনি নভেম্বর মাসে

অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের তীব্র সমালোচনা করে এক তথ্যপূর্ণ রিপোর্ট পেশ করেন।

এ বছরই তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের দিল্লি অধিবেশনেও সভাপতিত্ব করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে শেরেবাংলাই প্রথম এবং একমাত্র ব্যক্তি, যিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতবাসীরা ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকারকেও সকল প্রকার সাহায্য সহযোগিতা করেছিল। অবশ্য তার কারণ ও ছিল। তাদেরকে আশ্বাস দেয়া হয়েছিল.-যুদ্ধ শেষ হলেই ভারতকে স্বায়ত্তশাসন দেয়া হবে। ক্রমান্বয়ে দেয়া হবে স্বাধীনতা। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক ব্রিটিশ সরকার সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি শেষ পর্যন্ত।

এ কারণেই মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ১৯১৯ সালে শুরু হয়েছিল, সত্যাগ্রহ আন্দোলন। এ আন্দোলনকে পদদলিত করার জন্য পাস করা হয় কুখ্যাত ‘রাউলাট অ্যাক্ট’।

এ আইনের বলে সরকার যে-কোনো ব্যক্তিকে বিনা কারণে গ্রেফতার করতে পরত, জেলে ঢোকাতে পারত। এই কুখ্যাত আইনের বিরুদ্ধেও সারা দেশের মানুষ হয়ে উঠল প্রতিবাদমুখ; না, এ দমনমূলক আইন আমরা মানি না।

১৯১৯ সালের ২ ফেব্রুয়ারি এ কুখ্যাত আইনের বিরুদ্ধে ডাকা হল প্রতিবাদসভা। সভা অনুষ্ঠিত হল কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে। এই সভায়ও সভাপতিত্ব করেছিলেন শেরেবাংলা ফজলুল হক। এ সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন ভারতের আরও বহু প্রখ্যাত ও সংগ্রামী জন নেতা এদের মধ্যে ছিলেন বিপিন চন্দ্র পাল, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌলবি মুজিবর রহমান, অম্বিকাপ্রসাদ বাজপেয়ী, জীবনকৃষ্ণ রায়, আবুল কাশেম, পদ্মরাজ জৈন, পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রমুখ।

শেরেবাংলা এ কুখ্যাত আইনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, 'আমরা জানি, রাজকীয় ব্যবস্থা পরিষদে খুব শীঘ্রই একটি বিল উত্থাপিত হতে চলেছে। সে বিলের উদ্দেশ্য হবে এ দেশের সব রকমের রাজনৈতিক তৎপরতার সমাধি রচনা করা, এটুকু বোঝার ক্ষমতা ও কি আজ আমাদের নেই? জননেতারাই-বা আজ নীরব কেন? দেশবাসীর কণ্ঠই-বা আজ স্তব্ধ কেন? বজ্রের বুক থেকে ধ্বনি কেড়ে নিয়ে ক্রুদ্ধ আক্রোশে তারা কি আজ এগিয়ে আসতে পারে না?... নেতার খেতাব নিয়ে যাঁরা আজ আমাদের মাঝে বিরাজ করছেন, তাঁদেরকে আপনারা কথার চাবুকে চাঙ্গা করে তুলুন। পারস্পরিক যা কিছু বিরোধ, যা কিছু দলাদলি সব ভুলে আপনার সবাই হাতে হাত মিরিয়ে এগিয়ে আসুন একই প্লাটফর্মে, অন্তরে স্থান দিন কেবল ভারতেরই মঙ্গল চিন্তা সূচনা করুন। একটি সুষ্ঠু গঠনমূলক কর্মসূচি কেবল এভাবেই তাঁরা সেবা করতে পারেন দেশে, আশা করতে পারবেন অগণিত ভক্তের শ্রদ্ধাআপ্লুত সমর্থন।

এই বলের বিরুদ্ধে সারা ভারতে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন স্থানে চলতে থাকে মিটিং, বিক্ষোভ মিছিল। এরই ফলে ৯ এপ্রিল পাঞ্জাবে গ্রেফতার হন। ডাঃ সাইফুদ্দিন কিচলু এবং ডঃ সত্যপাল। এই গ্রেফতার আর নির্যাতনের প্রতিবাদেই অনুষ্ঠিত হয় ঐতিহাসিক জালিযানওয়ালাবাগের জনসভা। আর সেই শান্তিপূর্ণ জনসভায় ব্রিটিশ সরকারের মিঃ ও ডায়ার নামে জনৈক কুখ্যাত সেনাপতি নির্বিচারে হত্যা করে হাজার হাজার লোককে। সৃষ্টি করে ইতিহাসের জঘন্যতম এক কলঙ্কিত অধ্যায়ের। এটাই হল ইতিহাসের কুখ্যাত জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড, যে হত্যাকাণ্ডের নির্মম কাহিনী পড়লে আজ বিশ্বের মানুষ ভয়ে শিউরে ওঠে। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত 'নাইট' উপাি‌ধ ত্যাগ করেন।

অতঃপর জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জালিয়ানওয়ালাবাগের এই হত্যাকাণ্ডেরতদন্তের জন্য এ.কে ফজলুল হক, মাহাত্মা গান্ধী, দেশ বন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, সহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে উচ্চপর্যায়ে তদন্ত গঠিত হয়।

শেরেবাংলা ফজলুল হক ছিলেন যে-কোনো রকমের অন্যায় অবিচার আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটি সংগ্রমী প্রতিবাদ। যে-কোনো আন্দোলনের অগ্রনায়ক।

কিন্তু তাই বলে সবরকম আন্দোলনেরই যে তিনি সমর্থক ছিলেন একথাও সত্যি নয়। যে আন্দোলন জাতীয় জীবনের বৃহত্তর স্বার্থ বয়ে আনবে না, সে রকম কোনো কাজকে তিনি কখনও সমর্থন দিতেন না।

তিনি বুদ্ধি বিবেক দিয়ে আগে যাচাই করে দেখে নিতেন। ন্যায়-অন্যায় যাচাই করে নিতেন, তারপর জানাতেন সমর্থন কিংবা করতেন বিরোধিতা।

যেমন ১৯২০ সালের খিলাফত আন্দোলনের শিক্ষঃ বয়কট নীতি। তিনি আপন বুদ্ধি বিবেক বিবেচনার উপর নির্ভর করেই এর বিরোধিতা করেছিলেন।

এদেশেরই একদল তথাকথিত আন্দোলনকারী পাশ্চাত্য ভাবধারার শিক্ষানীতি বর্জন করার জন্য এ আন্দোলনের ডাক দেন। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য ছিল, আমরা বিদেশিদের স্কুলে পড়ব না, ইংরেজ সরকারের সাহায্য নেব না।

এ উদ্দেশ্যে ১৯২০ সালের ১৩ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় একটি সম্মেলন। শেরে বাংলা এ সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে এ শিক্ষা বয়কট নীতির সমালোচনা করে বলেন—

—আমাদের আজকের মূল আলোচনা হল—"শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আমাদের ছেলে-মেয়েদের প্রত্যাহার করা উচিত হবে কি না; বলা হয়েছে যে, বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের আলাপ-আলোচনার আর কোনো অবকাশ নেই। কারণ, আমাদের মওলানাগণ: ইতোমধ্যেই এই মর্মে ফতোয়া জারি করেছেন যে, ইসলামের প্রতি অবিশ্বাসী না হয়ে ছেলেমেয়েদের বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাখা যেতে পারে না। অতএব, আমাদের প্রথম বিবেচ্য বিষয় হল, মওলানাদের এই ফতোয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মুক্ত বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হতে পারি কি না। এ প্রশ্নে আমার ব্যক্তিগত অভিমত এই যে, ফতোয়ায় যাই বলা হোক না

কেন, আমাদের মহান ধর্ম আমাদেরকে যে-কোন প্রশ্ন বিবেক বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হওয়ার অনুমতি দিয়েছে।

—শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বয়কটের নীতি দ্বারা আমাদের হিতে বিপরীত হবে। কারণ এ দ্বারা একদিকে আমাদের কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না, অপরদিকে আমাদের জাতীয় স্বার্থের অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। বর্তমান সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বয়কট করতে হলে আমাদেরকে দ্বিবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। প্রথমত সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত সরকারি সাহায্য প্রত্যাখ্যান করা, যার ফলে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে এবং দ্বিতীয়ত নিজেদের জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকা সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়েকে প্রত্যাহার করে নিয়ে তাদের শিক্ষালাভের পথ রুদ্ধ করা।

আমার মতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত সরকারি সাহায্য প্রত্যাখ্যানের পরিবর্তে শিক্ষাখাতে আরও বেশি করে অর্থব্যয়ের জন্য ব্রিটিশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করাই হবে আমাদের কাজ। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা নিজেদের সেই জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারছি, ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রদত্ত সরকারি সাহায্য প্রত্যাখান করা চরম বোকামিরই পরিচয় হবে।'

গোঁড়াপন্থী কেউ কেউ শেরেবাংলার এ বক্তৃতার জন্য প্রথমে ভুল বুঝলেও মুক্ত বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন সবাই তাঁকে অকুণ্ঠ সমর্থন করেছিলেন।

শেরেবাংলা শিক্ষাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন। তিন বুঝতে পেরেছিলেন শিক্ষার সুষ্ঠু বিস্তার না হলে, শিক্ষার অগ্রগতি সাধিত না হলে, জাতীয় জীবনের এ দুর্গতিমোচন সম্ভব হবে না। মুসলমান সমাজকে উন্নত করতে হলেও সবার আগে তাদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তাদেরকে আগে আত্মসচেতন করে তুলতে হবে।

শেরেবাংলা তার সারা জীবনে শিক্ষার বিস্তারের জন্য যতগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন, শিক্ষার জন্য কাজ করেছেন, তার মধ্যে সবচেয়ে

উল্লেখযোগ্য হল ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনে যেসব মনীষীর আত্মত্যাগ ও অবদান রয়েছে শেরেবাংলাও ছিলেন তাদের অন্যতম। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনেও এর প্রধান উদ্যোক্ত স্যার সৈয়দ আহমদের সঙ্গে শেরে বাংলারও যথেষ্ঠ অবদান ছিল। তিনি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাউন্ডেশন মেম্বর অব দি ফাস্ট কোর্ট ছিলেন। এই কমিটিতে আর যাঁরা ছিলেন তার্গঁদের অন্যতম ছিলেন স্যার ফজলি হোসেন।

শেরেবাংলার জীবনের আরও একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হল 'দৈনিক নবযুগ' পত্রিকা প্রকাশ। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এদেশের মানুষকে রাজনৈতিক সচেতন করে তুলতে হলে, দেশ ও সমাজের কথা, মেহনতি মানুষের কথা জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে হলে চাই তার একটি অবলম্বন বা মাধ্যম। আর জনগণের সাথে যোগাযোগ সংরক্ষণের এই মাধ্যমই হল খবরের কাগজ। অতএব একটি দৈনিক পত্রিকা বের করার জন্য তিনি মনঃস্থির করলেন।

এই পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্যেই তিনি সেদিন (১৯১৯ সাল) তাঁর কলকাতাস্থ ৬ নং টার্নার স্ট্রীটের বাসায় ডেকে পাঠালেন কয়েকজনকে। এদের মধ্যে ছিলেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ, মুহম্মদ ওয়াজেদ আলি (ইনি একজন সাংবাদিক, কলকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াজেদ আলি সাহেব নন।) ফজলুল হক সেলাবর্ষী (সিলেট জেলার লোক, খবরের কাগজে লিখতেন) এবং মঈউদ্দিন হোসেন।

আলোচনা করে ঠিক করা হল একটি সান্ধ দৈনিক প্রকাশিত হবে। হক সাহেব চাইলেন কাগজটি মুসলমানি কায়দায় করতে হবে। কিন্তু কবি নজরুল ইসলাম, কমরেড মুফ্‌ফর আহমদ এ প্রস্তাবে রাজি হলেন না।

হক সাহেবের যুক্তি ছিল, হিন্দুরা তোমাদের কাগজ কিনবে না। পক্ষান্তরে মুসলমানরাও বুঝতে পারবে না যে কাগজখানা তাদের কি না। দুদিক থেকেই তোমরা মার খাবে।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম বললেন, দেশের যে অবস্থা তাতে দেশের দুসম্প্রদায়ের লোকেরাই কাগজ কিনবে। কাগজ চালাচ্ছেন হিন্দু না মুসলমান, তা তারা দেখবে না। আমরা এমন কিছু করতে পারি না, যার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে অথবা সাম্প্রদায়িকতায় উসকানি থাকতে পারে।

যদিও ফজলুল হক সাম্প্রদায়িক ছিলেন না, তথাপি তিনি চাইছিলেন কাগজটির মুসলিমঘেষা নাম হবে। তখন কমরেড মোজাফফর আহমদই নজরুলকে বললেন, তোমার কবিতার-শব্দেই নাহয় তুমি একটা নাম ঠিক করে দাও। তুমি কবিতায় তো অনেক আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার কর।

নজরুল একটু ভেবে নিয়ে বললেন, পত্রিকার নাম "নবযুগ" হলে কেমন হয়?

তখন শেরেবাংলাসহ সবাই একবাক্যে "নবযুগ" শব্দটি পছন্দ করলেন। তারপর সমস্ত বন্দোবস্ত করার পর ১৯২০ সালের ১২ জুলাই সত্যি সত্যি আত্মপ্রকাশ করল দৈনিক নবযুগ। এর যুগ্মভাবে সম্পাদনার দায়িত্বে রইলেন কাজী নজরুল ইসলাম ও কমরেড মোজাফ্‌ফর আহমেদ।

নজরুলের লেখার ফলে কাগজটি প্রথম দিনেই দারুণ জনপ্রিয়তা অর্জন করল। কিন্তু তা হলেও নবযুগের আয়ু বেশি দিন স্থায়ী হল না। কাগজের প্রতি নজরুলের প্রথম দিকে যেমন ঝোঁক ছিল অল্পদিনেই তা কেটে গেল। খেয়ালি মানুষ কবি নজরুল কাজে অমনোযোগী হয়ে পড়তে পড়েত শেষে একদিন চাকরিই ছেড়ে দিলেন। শেষে পত্রিকার পরিচালনায় নানা গোলযোগের কারণে কমরেড মুজাফ্‌ফর আহমদও দিলেন চাকরি ছেড়ে। পত্রিকা চালাবার মতো কোনো যোগ্য লোক না থাকায় নবযুগ বন্ধ হয়ে গেল।

১৯২২ সালে খুলনার এক উপনির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় লাভ করে হক সাহেব বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভায় প্রবেশ করেন।

৪. অভিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী

১৯২৪ সাল ছিল শেরেবাংলা ফজলুল হকের রাজনৈতিক জীবনের একটি স্মরণীয় বছর। এ বছরেই ১ জানুয়ারি তিনি তৎকালীন অভিব্যক্তি বাংলার শিক্ষামন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। এটা তার প্রথম মন্ত্রিত্বলভ। এই শিক্ষামন্ত্রীর পদগ্রহণ নিয়েই কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধের সৃষ্টি হয়। অতঃপর তিনি কংগ্রেসের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেন।

শিক্ষাবিভাগের দায়িত্ব নেয়ার পরপরই তিনি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাজ করেন। এর আগে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাক্ষের পদটি বরাবরই ছিল ইংরেজদের দখলে। অমন এটি গৌরবময় পদে কোনো বাঙালির যাবার কথা যেন কেউ কল্পনাও করতে পারত না সেকেলে।

কিন্তু শিক্ষাবিভাগের দায়িত্ব লাভ করে শেরেবাংলা এই অসাধ্যই সাধন করে ফেললেন। একেবারে সুকৌশলে তিনি এই কাজটি করে ফেললেন। এ যে বাঙালিদের জন্য কত বড় বিজয় ছিল তা বলােই বাহুল্য।

হক সাহেব শিক্ষামন্ত্রী হয়েছিলেন ১৯২৪ সালে। সেই বছরই শিক্ষাবিভাগের ডরেক্টরের পদটি খালি হয়। প্রেসিডেন্সি কলেজের তৎকালীন প্রিসিপাল ছিলেন মিঃ ওয়ার্ডসওয়ার্থ। মিঃ ওয়ার্ডসওয়ার্থ শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টরের ওই লোভনীয় শূন্য পদটি তিনিই দখল করতে চেয়েছিলেন। অমন একটি পদে যাওয়ার বড় বাসনা ছিল তার।

কিন্তু শেরেবাংলা খুব সুকৌশলে ওয়ার্ডসওয়ার্থের সেই বাড়াভাতে ছাই দিলেন। তিনি ওই শূন্য পদটি ওয়ার্ডওয়ার্থকে না দিয়ে, সেখানে বসলেন মিঃ ডিনকে।

এতে দারুণ ফল ফলল। ভয়ানক খেপে গেলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ সাহেব। রাগের চোটে আর কিছু করতে না পেরে শেষে নিজের প্রিন্সিপালের পদটাই ছেড়ে দিলেন।

হক সাহেবও যেন এই সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিলেন। তিনিও আর মুহূর্তকাল বিলম্ব না করে ওয়ার্ডসওয়ার্থের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে নিলেন এবং সেই শূন্য পদে নিয়োগ করলেন বাংলার র‍্যাংলার নামে খ্যাত মিঃ বি, এম, সেনকে। মিঃ সেনই হলেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম বাঙালি প্রিন্সিপাল।

শেরে বাংলার এই শিক্ষা মন্ত্রিত্রে আয়ুষ্কাল অবশ্য বেশিদিন ছিল না। মাত্র মাস কয়েক তিনি বহাল ছিলেন এই পদে। তবু এই স্বল্প কালের মধ্যেই তিনি অনেকগুলো উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিলেন।

তিনি শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালেই কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেন— ইসলামিয়া কলেজ। এ ছাড়াও দেশের দরিদ্র ও মেধাবী মুসলমান ছাত্রদের সাহায্যার্থে কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেন ‘মুসলিম এডুকেশন ফান্ড’।

মুসলমানদের জন্য পৃথক শিক্ষা দফতরেরও সৃষ্টি করেন তিনিই এবং খান বাহাদুর আহসানউল্লাহকে তার এডিশনাল ডিরেকটর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন পদে নিয়োগ করেন।

তিনি আরেকটি উল্লেখযোগ্য কাজ করেন। দেশের প্রতিটি হাই স্কুলে বাধ্যতামূলকভাবে মৌলবি নিয়োগ চালু করেন।

হক সাহেব শিক্ষা দফতরের দায়িত্ব হাতে নিয়ে দেখলেন দেশের প্রতিটি স্কুলেই মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা কম। তাই সব স্কুলেই এত অল্পসংখ্যক ছাত্রের জন্য একজন শিক্ষক রাখা ব্যয়বহুল মনে করে মৌলবি রাখা হত না। বাধ্য হয়ে

সব মুসলমান ছাত্রকেই শিক্ষকের অভাবে হিন্দু ছাত্রদের সাথে সংস্কৃত পড়তে হত।

হক সাহেব মন্ত্রী হয়েই আদেশ জারি করে দিলেন, না, সব হাই স্কুলে একজন করে মৌলবি রাখতে হবে। তাঁরা মুসলমান ছাত্রদেরকে আরবি-ফারসি পড়াবেন এবং ইসলামি বিষয়ে শিক্ষা দেবেন।

১৯২৬ সালের ঘটনা। শেরেবাংলা তখন আর মন্ত্রিত্ব্যের গদিতে বহাল নেই। নিজের সংগঠনের কাজে দেশের নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের কথা বলার জন্য, তাদের করুণ কাহিনী, দুঃখ দৈন্যের ইতিহাস শোনার জন্য ছুটে বেড়াচ্ছেন বাংলার পথে পথে। দিনরাত তিনি ছুটে বেড়াচ্ছেন গ্রামে গঞ্জে।

এই বছরই ঢাকা জেলার মানিক গঞ্জে ঘৰ টেছিল এক ঐতিহাসিক ঘটনা। মানিকগঞ্জের কৃষক-প্রজা আর স্থানীয় জমিদার-মহাজনদের মধ্যে চলছিল তীব্র বিরোধ। আসলে তখন এ অঞ্চলের অত্যাচার ধনী মহাজনদের নির্যাতন এত বেড়ে গিয়েছিল যে, সাধারন মানুষ একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। দেনার দায়ে এ অঞ্চলে গরিব কৃষকদের সব জমিজমাই প্রায় জমিদার-মহাজরেনা কেড়ে নিয়েছিল।

অত্যাচার চরমে উঠলে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষেরা উঠেছিল খেপে। তারই ফল-স্বরূপ কৃষক-প্রজাদের স্বার্থরক্ষা করার উদ্দেশ্যে এই মহকুমার ঘিওরহাটে আহ্বান করা হল এক বিরাট প্রজা সম্মেলন।

এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার জন্য শেরেবাংলাকে জানানো হল আমন্ত্রণ। তিনি সানন্দে এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। দেশের নিঃসঙ্গ নিরীহ যে কৃষক মজুরের জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করে আসছেন, আজ কি তাদের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারেন?

এ সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য চারদিক থেকে চলছিল স্বতঃস্ফুর্ত কর্মতৎপরতা। ঢাকা, পাবনা, ময়মনসিংহ, টাংগাইলসহ বহু অঞ্চল থেকে কৃষক-প্রজারা দলে দরে এসে যোগ দিতে লাগল এ সম্মেলনে।

এই মহাসম্মেলনে সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে শেরেবাংলা সারাদেশের মহাজন, জমিদারের অকথ্য প্রজা নির্যাতনের করুণ বিবরণী তুলে ধরলেন। এই অত্যাচারীদের হাত থেকে কৃষক-প্রজাদের বাঁচাতে হলে কোন কর্মপন্থা গ্রহণ করা যায়, কী করে দুর্বার আন্দােলন গড়ে তুলে সমস্ত নির্যাতিত কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করা যায়, তারও কর্মসূচি ব্যাখ্যা করলেন।

তিনি তাঁর সুদীর্ঘ ভাষণে তেজোদীপ্ত কণ্ঠে বললেন, দয়া করে জমি যখন নিয়েছে, এবার কর্তারা লাঙল চষুক, মাঠে নামুক, ফসল বুনুক, ফসল ফলাক, ফসল কাটুক।

শেরেবাংলার আহ্বানে সেই সম্মেলনে কৃষক-প্রজার শপথ গ্রহণ করে যে, তারা আর জমিদার মহাজনদের জমিতে লাঙল দেবে না।

এরপর সত্যি সত্যি প্রায় একবছর ধরে চলে এই কৃষক আন্দােলন। কৃষকরা এক বছর আর জমিদারের জমিতে লাঙল দেয়নি। অবশেষে বাধ্য হয়ে মানিকগঞ্জ মহকুমার জমিদার-মহাজনরা কৃষক-প্রজাদের প্রায় সব জমি ফেরত দিয়ে তাদের সাথে একটা অপসারফায় আসতে বাধ্য হয়।

মানিকগঞ্জ মহকুমার কৃষকদের সংগ্রামের এই সাফল্য শেরেবাংলাকেও খুব অনুপ্রাণিত করে তুলে। তখন তিনি এই আন্দোলনের ধারাকে জিইয়ে রাখার জন্য এবং একে একটি সুসংহত রূপ দেয়ার কথাও গভীরভাবে ভাবতে লাগলেন।

অবশেষে তাঁর এই প্রচেষ্টা সফল হয়। তিনি ১৯২৭ সালে কৃষক-প্রজাদের জন্য এবং তাদের নিয়েই একটি রাজনৈতিক দল গঠন করলেন। এই দলের নামকরণ করা হল 'নিখিল বঙ্গ কৃষক প্রজা-সমিতি'। দলের নেতা এবং সভাপতিও হলেন তিনিই।

ক্রমে এই দলের আরও বিস্তারলাভ হয়। জেলায় জেলায় গঠিত হতে থাকে। এর শাখা সমিতি। এমনি করে সারা বাংলাদেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে 'নিখিল বঙ্গ কৃষক-প্রজা সমিতি'। দলটি একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক সংগঠনের মতো শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

এরপর ১৯৩০ সালেও অনুষ্ঠিত হয় অনুরূপ আরেকটি কৃষক-প্রজা সম্মেলন। এটি অনুষ্ঠিত হয় পটুয়াখালি মহকুমার (তখনও পটুয়াখালি জেলা হয়নি) বরগুনা থানার গৌরীচন্ন গ্রামে। এটিও ছিল একটি স্মরণীয় কৃষক সম্মেলন।

ক্রমশই তাঁর চিন্তাধারা সরে আসতে শুরু করেছিল নিজের সৃষ্ট কৃষক প্রজা-সমিতির দিকে। তখন তিনি মূল সংগঠন মুসলিম লীগ অপেক্ষা কৃষক-সমিতি নিয়েই বেশি চিন্তাভাবনা করতে শুরু করলেন। আর এর পিছনেই দিতে লাগলেন সমস্ত সময় ও শক্তি।

তিনি যেন তখন থেকেই নতুন করে স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। তিনি ভাবতে শুরু করলেন নিজের আদর্শ, নিজের সাফল্যের পথ। তাঁর মনে হতে লাগল তিনি হয়তো মুসলিম লীগের নেতৃত্বের চেয়ে এই কৃষক-সমিতি নিয়েই সারা দেশে, সমাজে তাঁর ভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবেন। অতঃপর এই লক্ষ্যেই তিনি কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন পুরোদমে।

তবে এখানে একটি কথা বলা দরকার। শেরেবাংলা কৃষক-সমিতি গঠন করেছিলেন দেশের নিঃস্ব ভূমিহীন কৃষকসমাজের স্বার্থকে সামনে রেখেই। তবু তাঁর দলের পরিচালনার ভার কিন্তু একেবারে সেই কৃষকসমাজের হাতে ছিল না। এর সংগঠনিক তৎপরতা ন্যস্ত ছিল বাংলার মাধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর হাতে।

তখন সবাই ছিল জমিদারদের প্রজা। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান ও প্রজা! তাই মধ্যবিত্ত শিক্ষিতারাও নিজেদের স্বার্থ আর কৃষক-প্রজার স্বার্থকে একই দৃষ্টিতে দেখে আন্দোলনে শরিক হয়; আর এমনি করে করেই গড়ে ওঠে একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক দল। সৃষ্টি হয় একটি নতুন রাজনৈতিক আবহাওয়া।

শেরেবাংলা দেশের সাধারণ গণমানুষের স্বার্থের দিকে লক্ষ রেখে এবং একটি উদার অসাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে পড়ে তোলেন তাঁর কৃষক প্রজা-সমিতি।

এই সমিতির পক্ষ থেকে ১৯৩৬ সালে যে ইশতেহার প্রকাশিত হয়, তাতেই এই সমিতির আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা করা যায়।

সমিতিরি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলি ছিল নিম্নরূপ:

১। মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করে একটি দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে অবিলম্বে বর্তমান প্রাদেশিক শাসনতন্ত্রের এবং পরিকল্পিত কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্রের পরিবর্তে পূর্ণ গণতান্ত্রিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের জন্য পরিশ্রম করতে হবে।

২। ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করতে হবে।

৩। ভারতের মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ঐক্য গড়ে তুলতে হবে।

৪। ভারতের মুসলমানদের সঙ্গে অন্যান্য দেশের মুসলমানদের ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে ও সুদৃঢ় করতে হবে।

৫। আইনানুগ ও শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী জনসাধারণের স্বার্থবিরোধী জমিদারি প্রথার চিরস্থায়ী অবসান ঘটাতে হবে।

কর্মসূচিঃ

১। মুসলমানদের ধর্মীয় অধিকার সংরক্ষণ করতে হবে। ধর্মীয় বিষয়ে যদি কোনো জটিলতা দেখা দেয়। তবে জমিয়াত-উল-উলেম হিন্দের এবং মুজাহিদদের মতামতের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে তা সমাধান করতে হবে।

২। সকলপ্রকার পীড়নমূলক আইন, যথা বেঙ্গল ক্রিমিনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, পাবলিক সিকিউরিটি অ্যাক্ট ইত্যাদি বাতিল করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

৩। যেসব বিধিব্যবস্থা বাংলাদেশ ও ভারতের স্বার্থবিরোধী, যা জনসাধারণের মৌলিক স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করে এবং দেশকে অর্থনৈতিক শোষণের অন্তর্ভুক্ত করে তার বিরোধিতা করতে হবে।

৪। প্রাদেশিক শাসনতন্ত্রের জন্য যে প্রভূত খরচ হচ্ছে তা কমাতে হবে এবং দেশগঠনের প্রয়োজনীয় বিভাগগুলোর জন্য আরও বরাদ্দ করতে হবে।

৫। কুটির শিল্পসহ অন্যান্য শিল্পগঠনের প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করতে হবে। এজন্য কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। যেমন—

ক. অবিলম্বে পাটের সর্বনিম্ন মূল্য বেঁধে দিতে হবে।

খ. প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপন্নজাত দ্রব্য গোটা প্রদেশে কেনাবেচার ব্যবস্থা করার জন্য একটি সংস্থা গঠন করতে হবে।

গ. সমস্ত সরকারি প্রয়োজনে ভারতীয় দ্রব্য ব্যবহার করতে হবে।

ঘ. বৃহৎ ও ভারী শিল্পগঠনের জন্য ঋণদানের ব্যবস্থা করতে হবে

৬। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রয়োজনে মুদ্রা, বিনিময় ও মুল্য নির্ধারণ করতে হবে।

৭। গ্রামের সাধারণ মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষার উন্নতি সাধন করতে হবে।

৮। প্রয়োজন হলে অর্থসংগ্রহ করে ঋণে জর্জরিত কৃষকদের দুরবস্থা লাঘব করতে হবে।

৯। কৃষকদের উপর কোনো নতুন কর বা ট্যাক্স না বসিয়ে প্রাইমারি শিক্ষাকে অবৈতনিক ও আবশ্যিক করতে হবে।

১০। মাতৃভাষার উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে উর্দুভাযা ও হরফ রক্ষা করতে হবে ও তার উন্নতির সাধান করতে হবে।

১১। মুসলমানদের, বিশেষ করে বাংলাদেশের মুসলমানদের অবস্থা উন্নয়নের জন্য উপায় উদ্ভাবন করতে হবে।

১২। দরিদ্র জনসাধারণের উপর করের বোঝা লাঘব করতে হবে।

১৪। কৃষিজীবী মানুষের স্বার্থে এবং জমিতে কৃষকের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য বেঙ্গল টেনান্সি অ্যাক্ট সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করতে হবে এবং নিম্নোক্ত বিষয়গুলো একটি নতুন আইনে যুক্ত করতে হবেঃ

ক. নজর ও সেলামি আদায়ের যে অধিকার জমিদাররা ভোগ করেন তা রহিত করতে হবে।

খ. অতিরিক্ত খরচ না করে ও কৃষকদের নাম পরিবর্তনের অধিকার মেনে নিতে হবে।

গ. খাজনার পরিমাণ কমাতে হবে।

১৫। জমিদার, মহাজন ও তাদের প্রতিনিধি। কর্তৃক বেআইনি আদায়ের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ও কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

১৬। পাটের উপর শুল্ক বাবদ আদায়কৃত অর্থের সবটাই ভারত সরকারের কাছ থেকে নেবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে এবং কৃষি ও গ্রামীণ স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতির জন্য খরচও নির্ধারণ করতে হবে।

১৭। কৃষি ও গবাদি পশুর উন্নতি ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৮। গ্রামে প্রয়োজনীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৯। বাংলাদেশের মরা নদনদীগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে।

২০। প্রতিটি সম্প্রদায়ের মানুষ যাতে সুবিচার পান সে দিকে লক্ষ রেখে বিভিন্ন কার্যে মুসলমান ও তফশিলি সম্প্রদায়ের লোকদের নিয়োগ যাতে প্রয়োজনানুরূপ হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

২১। বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য উপায় উদ্ভাবন করতে হবে।

২২। শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি নির্দিষ্ট করে এবং বাসস্থান ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে তাদের অবস্থার উন্নতি সাধন করতে হবে।

ফজলুল হক মুসলিম লীগের কর্মসূচিতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। আর এজন্যই তিনি এই নতুন কর্মসূচি তৈরি করলেন। আর এই নতুন কর্মসূচিই হল কৃষক

প্রজা সমিতির আদর্শ। এই কর্মসূচির ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বললেন, কৃষক প্রজা সমিতি দরিদ্রের স্বার্থরক্ষা করবে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য এই দলের দরজা খোলা থাকবে। খাদ্য ও বস্ত্রের সমস্যাই হল সবচেয়ে জরুরি।

এই সময়ে শেরে বাংলা ছিলেন একই সময়ে একদিক মুসলিম লীগ এবং অপর দিকে কৃষক প্রজা সমিতির সভাপতি। একই ব্যক্তি দু দুটো প্রতিষ্ঠানের সভাপতি কেন? সম্পর্কে তাঁর যুক্তি ছিল সত্যি অপূর্ব।

প্রখ্যাত সাংবাদিক সাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমেদ তাঁর "আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর" বইতে বলেছেন, 'পার্টির অনুরোধে একদিন হক সাহেবকে বললামঃ আপনি দুই সভাপতিত্বের একটা ছেড়ে দিন এই আমাদের আরজ।

তিনি নিতান্ত আন্তরিকতার সঙ্গে উত্তর দিলেন, মুসলিম বাংলাকে বাঁচাতে হলে মুসলিম লীগও করতে হবে, কৃষক প্রজা সমিতিও চালাতে হবে। মুসলিম লীগ যেমন ভারতীয় মুসলমানের জন্য দরকার, কৃষক-প্রজা সমিতি করা তেমনি বাঙালি মুসলমানদের জন্য দরকার। আমি কৃষক-প্রজা সমিতির সভাপতিত্ব ছেড়ে দিয়ে ওটাকে কংগ্রেস নেতাদের হাতে তুলে দিতে পারি না, আবার মুসলিম লীগের সভাপতিত্ব ছেড়ে দিয়ে ওটাকে 'খাজাগজাদের' হাতে তুলে দিতে পারি না।

১৯২৮-৩১ সালে তিনি লন্ডনে প্রথম গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। এই গোল টেবিলে যোগদান নিয়ে কংগ্রেসের নেতাদের সাথে তাঁর মতবিরোধ ঘটে। কংগ্রেস এই বৈঠক বয়কট করে। কিন্তু তিনিও কংগ্রেসের অনুমতি ছাড়াই বৈঠকে যান। তিনি লণ্ডনের গোল টেবিল বৈঠকে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, আমাদের ধমনীতে গোলামের রক্ত প্রবাহিত নয়।' শেরেবাংলার এই একটিমাত্র কথা থেকেই সেদিন পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা মূল কথা।

তিনি পরের বছর অর্থাৎ ১৯৩১-৩২ সালেও লন্ডনের দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করতে যান; মূলত তিনি চাইতেন সবরকম আলোচনার পথ খোলা রাখতে; সেজন্যই তিনি এই আলোচনায় বসেছিলেন।

১৯৩২ সালে লন্ডনের গোলটেবিল বৈঠক থেকে ফিরে এলেন শেরেবাংলা-এর কিছুদিন পরেই ময়মনসিংহে কৃষক প্রজা সমিতির এক সম্মেলন ডাকা হয়। সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন আবুল মনসুর আহমেদ, মওলানা শামসুল হুদা, খান বাহাদুর ইসমাইল, গিয়াসউদ্দীন পাঠান, নূরুল আমিন এবং শাহ আবদুল হামিদ।

সভায় সভাপত্বি করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হল শেরেবাংলাকে। তিনি ছাড়াও এই সম্মেলনে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আর যারা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন – মাওলানা আকরাম খাঁ, নলিনীরঞ্জন সরকার. কে. জি. এম. ফারুকী প্রমুখ।

উপস্থিত বক্তারা অনেকেই গরম গরম বক্তব্য পেশ করলেন সভায়। তবে সভার অন্যতম আকর্ষণ ছিলেন মরমি কণ্ঠশিল্পী আব্বাদউদ্দেনের হান। একসময় উব্বাসউদ্দিন তাঁর মনমাতানো কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন—

“ওরে চাষী জগৎবাসী
ধর কষে লাঙ্গল।”

অবশেষে উঠলেন শেরেবাংলা। তিনি তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতায় দেশের কৃষকপ্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা আর জমিদার মহাজনদের অত্যাচার-নির্যাতনের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করে শেষে বললেন, কিন্তু ভাই সব ভয় নেই, ঐ চেয়ে দেখুন, দুঃখের রাত পোহাবার পথে। পূর্ব গগনের দিগন্তে নতুন প্রভাতের আলো ঝিকমিকিয়ে উঠছে। তাই আমার ভাই আব্বাসউদিনের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমিও কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায় ডেকে বলছিঃ

ওরে চাষী জগৎবাসী ধর কষে লাঙ্গল।

সঙ্গে সঙ্গে সমবেত লাখো জনতা শেরেবাংলার সাথে গলা মিলিয়ে গেয়ে উঠল— ওরে চাষী...।

১৯৩৪ সালে শেরেবাংলা কলকাতা করপোরেশনের মেয়রের পদের জন্য তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তার প্রতিদ্বন্দী ছিলেন মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার। শেরেবাংলা নির্বাচনে জয়লাভও করেছিলেন। কিন্তু ক্ষমতা লাভ করতে সক্ষম হননি। কারণ বাংলার লাটসাহেবের মনোনীত তদানীন্তন মন্ত্রী নাজিমুদিন এবং মিঃ বিজয়প্রসাদ সিংহরায় হক সাহেবের এই মেয়র নির্বাচনকে সুকৌশলে বাতিল করে দেন এবং নলিনীবাবুকে বিজয়ী ঘোষণা করেন।

১৯৩৫ সালে শেরেবাংলা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভায় নির্বাচিত হন।

এই সময় তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগেরও ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ছিলেন। মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন আগা খান। কিন্তু তিনি প্রায় সময়েই দেশের বাইরে থাকতেন। দীর্ঘদিন ধরে তাঁর দেশের বাইরে অবস্থানের দরুন সাংগঠনিক দিক দিয়ে দলের দারুণ ক্ষতি হচ্ছিল। অতঃপর শেরেবাংলা বাধ্য হয়েই সংগঠনের খাতিরে দলের সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

এ বছরই ঘটেছিল একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯৩৫ সালের মার্চ মাসের ঘটনা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্রাট পঞ্চম জর্জের সিংহাসন আরোহনের রজত জয়ন্তী।

সারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এক মহা উৎসব। স্বয়ং সম্রাট পঞ্চম জর্জের জয়ন্তী উৎসব। যা-তা কথা নয়। তাই সবাইকেই হাসতে হবে, গাইতে হবে, খুশিতে নাচতেও হবে।

আদেশ জারি হল— দেশের সকল ধর্মের লোককে সর্বত্র মসজিদ, মন্দির এবং গির্জায় গির্জায় সম্রাটের দীর্ঘায়ু কামনা করে প্রার্থনা-অনুষ্ঠান করতে হবে।

কিন্তু সেদিন সারা ভারতের মাত্র একটি লোকই এই অন্যায় ও অবৈধ আদেশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। আর তিনিই হলে শেরে বাংরা ফজলুল হক। ইসলামের নির্ভীক সৈনিক এই অন্যায় আদেশের প্রতিবাদ জানিয়ে এক জনসভায় ঘোষণা করলেন— মুসলমান তারা তাদের মসজিদে কোনো বিধমীর্ণ নাছারার জন্য প্রার্থনা করতে পারবে না।

এটা যে শুধু শেরেবাংলার ঔদ্ধত্য বা বৃথা আস্ফালন ছিল তা নয়, তার ডাকে সাড়া দিয়ে গোটা ভারতের সব মুসলমান সেদিন একসাথে রুখে দাঁড়িয়েছিল এবং সত্যি সত্যি সারা ভারতবর্ষের কোন মসজিদে ব্রিটিশ সম্রাটের জন্য প্রার্থনা-অনুষ্ঠান হয়নি।

অবশ্য এই ঘটনা নিয়েই শেরেবাংলার সাথে মুহম্মদ আলি জিন্নাহর মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। মিঃ জিন্নাহ ফজলুল হকের এই কার্যক্রমকে, অর্থাৎ প্রভু ইংরেজদের সাথে এমন সরাসরি সংঘর্ষে যাওয়ার ব্যাপারটা সমর্থন করতে পারেননি।

প্রথমবার শেরেবাংলা কলকাতা করপোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হলেও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারেননি। ক্ষমতায় গিয়েছিলেন নলিনীরঞ্জন সরকার। এবার সেই নলিনীরঞ্জন সরকার নিজেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়িয়ে শেরে বাংলা ফজলুল হককে সমর্থন ও তার নাম প্রস্তাব করে বসলেন। তখনকার প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব নলিনী বাবুর সমর্থন লাভ করে ফজলুল হক সর্বসম্মতভাবে কলকাতা করপোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হয়ে গেলেন। উল্লেখ্য যে, বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি এই গৌরবের অধিকারী হয়েছিলেন।

শেরেবাংলা মুসলিম লীগের সদস্য হলেও তাঁর মন পড়ে থাকত কৃষক সমিতির প্রতি। তিনি দেশের মাটি থেকে অত্যাচার শোষক জমিদার-মহাজনদের উচ্ছেদ করার ব্যাপারে ছিলেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু মুসলিম লীগের অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন এই জমিদার-মহাজন শ্রেণীর। অভিজাতদের প্রভাব ও

ছত্রছায়াতেই পার্টি চলে। কিন্তু এদের দিয়ে দেশের সাধারণ কৃষক-প্রজাদের ভাগ্যের পরিবর্তন আসতে পারে না। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, জমিদারিকবলিত মুসলিম লীগ দেশের ভাগ্যবিধাতা হলে দেশের ভাগ্যাহত নিরন্ন প্রজাদের আরও সর্বনাশ হবে। তাই তিনি নীতিগতভাবেই আদর্শের প্রশ্নে মুসলিম লীগ নেতাদের সাথে এক হতে পারলেন না।

তাই তিনি ১৯৩৬ সালে আগস্ট মাসের মাঝামাঝি সময়ে কলকাতার এক সম্মেলনে দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, —

'আজ হতে আবার শুরু হবে বাংলার হাটে-মাঠে, কাননে-প্রান্তরে জলে-স্থলে, দিবা-নিশি জমিদারের বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম। আল্লাহর রহমতে আমি অচিরেই ঘটাব জমিদারির অবসান। বুক ফুলিয়ে, মেরুদণ্ড সোজা করে, শির উঁচু করে দাঁড়াবে বাংলার আট কোটি কৃষক-প্রজা। ছিনিয়ে নেবে তারা তাদের যাবতীয় অধিকার। জমিদারের সাধ্য নেই কৃষক-প্রজাদের আর পায়ের তলে দাবিয়ে রাখে। জাগ্রত জনতার বজ্রহুংকারে জমিদারির জগদ্দল পাথর ফুৎকারে উড়ে যাবে। আল্লাহর রহমতে কৃষক প্রজার জয় অবশ্যম্ভাবী।

এই বক্তৃতা, এই ঘোষণা শুধু তার বৃথা বাগাড়ম্বর ছিল না। তার কথা ও কাজ ছিল একই সূত্রে গাঁথা।

তিনি এই আদর্শে ও লক্ষ্যে অটল থেকেই কাজে অগ্রসর হতে লাগলেন এবং একদিন সত্যি সত্যি তার লক্ষ্য ও আদর্শ প্রতিষ্ঠায় সক্ষমও হয়েছিলেন। দেশের অত্যাচারী জমিদারদের হাত থেকে তিনি রক্ষা করেছিলেন দেশের সাধারণ প্রজাদেরকে। বলতে গেলে কলকাতার সেই ঐতিহাসিক ঘোষনার পর থেকেই তিনি তার আদর্শ ও লক্ষ্যের প্রতি আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন এবং মুসলিম লীগের প্রতি তাঁর আস্থা কমতে শুরু করে।

মুসলিম লীগের সাথে শেরেবাংলার এই মতপার্থক্য আরও স্পষ্টতর হয়ে ওঠে পরের বছর থেকে।

পরের বছর অর্থাৎ ১৯৩৭ সালেই ঘটে বাংলার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। এ বছরই অনুষ্ঠিত হয় অখন্ড বঙ্গদেশে ঐতিহাসিক নির্বাচন। এই নির্বাচনের একদিকে বঙ্গীয় মুসলিম লীগ নেতা শেরেবাংলা— তিনি মুসলিম লীগের বিরুদ্ধেই প্রতিদ্বন্দ্বিতীয় নেমেছেন। এ লড়াই তাঁর আদর্শের লড়াই, দেশের কৃষক-শ্রমিককে বাঁচাবার লড়াই।

নির্বাচনে শেরেবাংলার প্রতিদ্বন্দী হলেন বিরাট জমিদারির স্বত্বাধিকারী ঢাকার নবাববাড়ির প্রতিনিধি ও মুসলিম লীগ নেতা খাজা নাজিমুদ্দিন। খাজা নাজিমুদ্দিন ছিলেন অগাধ অর্থের মালিক, তদুপরি বাংলা সরকারের ক্ষমতাসীন সকল মন্ত্রী, সরকারি কর্মচারী তার পক্ষে। অপরদিকে শেরেবাংলা হলেন দেশের অতি সাধারণ ও নিঃস্ব মানুষের প্রতিনিধি।

সাধারণ অর্থে এ যেন এক অসম যুদ্ধ; তবু শেরেবাংলা সত্যিকার সিংহের মতোই সগর্জনে চ্যালেঞ্জ করে বসলেন তাকে। খাজা নাজিমুদিন বাংলার যেখান থেকে দাঁড়াবেন, তিনিও সেখান থেকেই দাঁড়াবেন। তার মোকাবিলা করবেন।

খাজা নাজিমুদ্দিন ছিলেন পটুয়াখালির জমিদার। অতঃপর পটুয়াখালিই হল এই নির্বাচনযুদ্ধের পানিপথ।

শেরেবাংলার কতটা জনপ্রিয়তা ও সামাজিক প্রভাব ছিল, এই নির্বাচন উপলক্ষে প্রদত্ত একটি বিবৃতি থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি নির্বাচনের প্রস্তুতির শুরুতে একবার বলেছিলেন—

—আমি এখন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যাচ্ছি যেখানে আমার বিপক্ষে আছেন প্রবল প্রতিপত্তিশালী ধনী জমিদার ও নাইট উপাধিধারী ব্যক্তিগণ। খোদা না করুক। যদি আমি পরাজিত হই, আমার এই পরাজয় ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয়ের চেয়ে গৌরবমণ্ডিত হবে।'

নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে আসতেই দুপক্ষের সমর্থকদের হাঁকড়াক, চিৎকার আর তৎপরতায় রণক্ষেত্র সরগরম হয়ে উঠল। তবে বেশি জমজমাট অবস্থা হল

খাজা নাজিমুদ্দিনের সমর্থকদের শিবিরগুলোতে। খাজা সাহেবের নির্বাচনি শিবিরে সব রাজকীয় শান শওকত। গরম গরম খানা, তরতাজা টাটকা সব জিনিস।

অপরদিকে নিরন্ন প্রজাদের দল কৃষক প্রজা পার্টির কোনো শিবিরই নেই। হাটে মাঠে, হালটে, গাছের ছায়ায় বসে কর্মীরা কাজ করছে। নেতার পোশাক-পরিচ্ছদও কর্মীদের মতোই দীনহীন। মাথায় সাধারণ কিস্তি টুপি, গায়ে পাঞ্জাবি, পরনে পাশের গাঁয়ের তাঁতি হারেশ আলির নিজের বোনা লুঙ্গি, আর পায়ে চটি। চমৎকার পোশাক। এই নিয়েই তিনি ছুটে বেড়াচ্ছেন বাংলার পথে-প্রান্তরে।

সেদিন শেরেবাংলা তাঁর দলবল নিয়ে নির্বাচনি প্রচারণায় এসেছেন। পটুয়াখালির এক পল্লি এলাকায়, স্থানীয় বগা ষ্টেশনে স্টীমার থেকে নেমে পড়লেন তিনি! কিন্তু যেখানে নির্বাচনি জনসভা অনুষ্ঠিত হবে, সে জায়গায়াটা ছিল আরও ভিতরে; সেখানে থেকে ও চোদ্দ/পনেরো কিলোমিটার।

এবার চাপতে হল নৌকায়। সাথিদের নিয়ে ভাড়া করা নৌকায় উঠলেন ফজলুল হক। এদিকে সকাল থেকে পেটে কোনো দানাপানি পড়েনি, পেটে দারুণ ক্ষুধা কি আর করেন!

অতঃপর তিনি হামলা চালালেন নৌকার মাঝিদের পান্তাভাতের উপরেই মাঝিদের বাসনে বাসি পান্তাভাত খেয়ে তাদের সাথেই একত্রিত হয়ে নৌকার দাঁড় টেনে, পাড়ি দিয়ে এলেন দীর্ঘ পথ।

শেরে বাংলার এ কাণ্ড দেখে মাঝিরা কিন্তু মোটও অবাক হল না। তিনি তাদের রাখা পান্তাভাত খেয়েছেন তো কী হয়েছে? তিনি এত বড় লোক হয়ে ও তাদের সাথে নৌকায় দাঁড় টেনেছেন। তা তো টানবেনই। তিনি যদি তাদের মতো নিঃস্ব শ্রমিকের জীবনের নৌকার দাঁড় না টানবেন, তবে আর কে টানবেন? তিনি যে তাদেরই লোক, তাদেরই প্রিয় নেতা। গরিবের যে দুঃখ, সেটাতো তারও দুঃখ আর তার বিজয় মানেই একজন সাধারণ মানুষের বিজয়।

শেরেবাংলার বক্তৃতা শোনার জন্য হাজার হাজার লোকের আগমন ঘটেছে। প্রায় পঞ্চাশ-যাট হাজার লোক। ইতোমধ্যেই সৌকায় পান্তা ভাত খাওয়া আর মাঝিদের সাথে দাঁড় টানার গল্প রূপকথা হয়ে সারা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে।

এমন যিনি নেতা, তাকে দেখার জন্য, তার বক্তৃতা শোনার জন্য চারপাশের গ্রাম থেকে পান্তাভাতের দল, দাঁড়টানার দল, কাস্তে কোদাল মােথালের দল ঝাঁকে ঝাঁকে এসে জমা হতে লাগল ময়দানে; লোকে লোকারণ্য। উপস্থিত সবাই প্রায় কৃষক শ্রমিক।

হক সাহেব কখনও হাস্যরস মিশিয়ে, কখনও বাঘের মতো তর্জন গর্জন করে, কখনও করুণ রসে নয়ন সিক্ত করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করতে লািগলেন। তখন চারদিক থেকে সহস্র কণ্ঠে ধ্বনি উঠিল, হক সাহেব জিন্দবাদ! হক সাহেব জিন্দাবাদ!

১৯৩৭ সালের এই নির্বাচনে শেরেবাংলা সারা পটুয়াখালির হাটে-মাঠে-ঘাটে কী রকম আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, তার কিছু বিবরণ শুনেছি আমার (গ্রন্থকার) এক সহকর্মীর মুখে; আমার এককালের সহকর্মী কবি লুৎফুর রহমান জুলফিকারের কাছে। তিনি তাঁর বাংলা কালের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে শেরেবাংলার এই ঐতিহাসিক নির্বাচন সম্পর্কে লিখেছেন—

আমার এখনও বেশ মনে আছে, আমরা যারা বরিশাল শহর থেকে স্কুল কলেজ মাদ্রাসার ছাত্রগণ শেরে বাংলার পক্ষে পটুয়াখালি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলাম। তারা দেড় মাস পর্যন্ত খাওয়া দাওয়া গোছল করা ইত্যাদি ত্যাগ করে শুধু চিডড়ার থলে কাঁধে নিয়ে এবং চিড়া চিবিয়ে দিবারাত্রি গ্রামে থেকে গ্রামান্তরে হক সাহেবের পক্ষে নির্বাচনী প্রচার অভিযান চালিয়েছি আর দলবেধে গান করেছি। সেই গানের দুই একটা লাইন এখনও বেশ স্মরণে আসে।

হক সাহেবকে ভোট দিলে ভাই
বাঁচবি তোরা ধনে প্রাণে

হক সাহেবের নাই তুলনা
খোদা ছাড়া ভয় করে না।   ইত্যাদি

আরো গেয়েছি—

বহুৎ বহুৎ সালাম জানাই
হে দুঃখীর ব্যথী।
হক তুমি না করিলে উপায়
মোদের উপায় আছে কি?

ফজলুল হক তাঁর অপূর্ব বাগ্মিতা ও সাংগঠনিক দক্ষতার বলে সারা নির্বাচনি অঞ্চলে এমন আলোড়ন সৃষ্টি করে ফেললেন যে মুসলিম লীগাররা রীতিমতো ঘাবড়ে গেল অঞ্চলের ছাত্র কৃষক শ্রমিক সবাই একজোটে নেমে পড়েছে তাদের প্রিয় নেতা শেরেবাংলার পক্ষে।

অবস্থা বেগতিক দেখে খাজা নাজিমুদ্দিন ফন্দি আঁটতে লাগলেন কেমন করে ফজলুল হকের এই জনপ্রিয়তা নষ্ট করা যায়। কেমন করে তাঁকে জনগণের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করা যায়।

যেমন কুচিন্তা তেমন দুষ্কর্ম। শেরে বাংলাকে হেয় প্রতিপন্ন করার দায়িত্ব দেয়া হল এক এস. ডি. ও সাহেবকে। এই লোকটি ও ছিলেন শয়তানের আর এক শিরোমণি । তিনি নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে বের করলেন এক অভিনব ফন্দি।

তিনি দুই মাননীয় অতিথিকেই একদিন দাওয়াত করলেন। দুজনকে দুটি প্রতিষ্ঠান উদ্বোধন করার দাওয়াত।

খাজা নাজিমুদ্দিনকে ডাকা হল জীবনের প্রতীক একটি মাতৃসদন উদ্বোধন করার জন্য আর একই দিনেই প্রায় পাশাপাশি মৃত্যুর প্রতীক একটি গোরস্তান

উদ্বোধন করার জন্য ডাকা হল শেরেবাংলা ফজলুল হককে। চমৎকার বুদ্ধি যাকে বলে।

ফজলুল হক এস. ডি. ও-র চালাকি ধরতে পারলেন। মুখে কিন্তু কিছু বললেন না। তিনি হাসিমুখেই আলহামদুল্লিাহ্ বলে দাঁড়ালেন গিয়ে গোরস্তানের পাশে। তারপর উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের উদ্দেশ্য করে দরাজ গলায় বলতে লাগলেন –

—ভাইসব, এই গোরস্তানই হল পরকালে যাবার প্রবেশপথ। তাই এখানে এলেই মানুষের মনে উদয় হয় হাসরের ময়দানের শেষ বিচারের দিনের কথা। আপনারা এখানে যারা উপস্থিত আছেন, তারা ভোটদানের সময় যা সঠিক কর্তব্য বলে মনে করেন, তা-ই করবেন। কিন্তু মানুষের খাতিরে বা কারো মুখ চেয়ে কিছু করবেন না। এই গোরস্তানে কবর দেবার মতো কোনো লাশ এখন উপস্থিত নেই। তা হলে চলুন, আজ আমরা এখানে সবাই মিলে দেশের সকল হিন্দু-মুসলমানের হিংসা-বিদ্বেষকে কবর দিয়ে যাই। আর সেইসাথে কবর দিয়ে যাই সকল জমিদার-প্রজার ভেদাভেদ।

যেই-না বলা আর অমনি সমবেত জনতার মধ্য থেকে ধ্বনি উঠল-হক সাহেব জিন্দাবাদ! হক সাহেব জিন্দাবাদ!

নির্বাচনের দিন যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল ততই রীগারদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়তে লাগল। সারা পটুয়াখালি জুড়ে শুধু শেরেবাংলার নাম, আর তাঁরই জিন্দাবাদ! অবস্থা বেগতিক দেখে অবশেষে ঢাকার নবাব হাবিবুল্লা বাহাদূর এসে নামলেন মাঠে।

তিনি তাঁর বিলাসবহুল বজরা নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন নদীপথে আর এঘাটে ওঘাটে বজরা ভিড়িয়ে গায়ের চাষাভুষাদের ডেকে ডেকে খাওয়াতে লাগলেন কোর্মা – পোলাও। আর সবাইকে বলে দিতে লাগলেন— তারা যেন খাজা সাহেককেই ভোট দেয়। শেষে অবস্থা এমনই হল এই নবাবের বজরার

শাহী খানার কথা সারা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। খবর পেয়ে শাহী খানার লোভে দলে দলে ছুটতে লাগল এ গাঁয়ের ও গাঁয়ের লোক।

দেখে তো নবাব সাহেব ও মহাখুশি। নিশ্চয়ই এরা সবাই মুসলিম লীগের সমর্থক।

কিন্তু তারা সত্যিকারভাবে কার সমর্থক ছিল তার পরিচয় তিনি একদিন হাতেনাতেই পেয়ে গেলেন।

সেদিন নবাবের সুসজ্জিত বজরায় জীবনের এই প্রথম কোর্মা পোলাও খেয়ে গাঁয়ের এক ষাট বছরের বুড়ো দুহাত তুলে খোদার কাছে মোনাজাত করতে লাগলেন। বুড়ো চাষি স্বয়ং নবাব সাহেবের সামনে বসেই হক সাহেবের বিজয়ের মোনাজাত করতে লাগলেন।

শুনে নবাব তো মহাগোস্যা, এ্যাঁ মিয়া, এটা কী কর? আমার নৌকায় খানা খেয়ে আমারই দুশমনের জন্য মোনাজাত করছ? কার খাও, আর কার জন্য মোনাজাত কর? এ্যাঁ...?

লোকটি উত্তর দিল, হুজুর, আমি ঠিকই করত্যাছি! হক সাহেব আইছেন, বাল্যাইত আপনিও আইছেন! হক সাব না আইলে, আপনিও আইতেন না, আর আমরাও কোর্মা পাোলাও খাইবার পাইতাম না! হক সাহেবের লাইগ্যাইত এসব আইলো। তা অইলে হক সাহেবের লাইগ্যা মোনাজাত না কইর্যা কার লাইগ্যা করুম?

১৯৩৭ সালের এই নির্বাচনি লড়াই কেমন জমে উঠেছিল তার সামান্য পরিচয় পাওয়া যায় বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবী আবুল হাশিমের স্মৃতিকথা থেকেও। তিনি তাঁর স্মৃতিকথাতে এই নির্বাচন প্রসঙ্গে লিখেছেন—

'—মিঃ সোহরাওয়ার্দী আমাকে বললেনঃ বরিশালে আমি পেরে উঠলাম না: তুমি বর্ধমান ছেড়ে পটুয়াখালিতে চলে এস!

পটুয়াখালিতে এসে দেখতে পেলাম, মিঃ ফজলুল হক নির্বাচনী ময়দানে আগে থেকেই কাজ করে চলেছেন। মিঃ আর.পি. সাহার ষ্টীমলঞ্চ আমাকে ছেড়ে

দেওয়া হল। মিঃ হক পটুয়াখালির বাইরে যাতে নজর দিতে না পারেন, সে জন্য আমি দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা তাকে তাড়া করে ফিরতে লাগলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য কর্মশক্তি, এই শ্রদ্ধেয় জননেতার, তিনি এ বৃদ্ধ বয়সেও তার কাঠের নৌকায় চড়ে দিনরাত অক্লান্তভাবে চরকির মত ঘুরতে লাগলেন।—

তিনি সত্যিই লৌহ মানব ছিলেন।

নির্বাচনে অবশেষে প্রত্যাশিত ফলই ফলল। খাজা নাজিমদিন শেরেবাংলার কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করলেন।

তখন আইন পরিষদের মোট আসন সংখ্যা ছিল ২৫০টি। এর মধ্যে আবার শ্রেণীভেদ ছিল। যেমন—মুসলমানদের জন্য আসন নির্দিষ্ট ছিল ১১৯টি। তবে নির্বাচক মণ্ডলীর প্রতিনিধিসহ মুসলমানদের আসন ছিল ১২২টি। বর্ণহিন্দু ৬৪টি তফশিলি সম্প্রদায়—৩৫টি, ইউরোপীয়ান—২৫টি এবং অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান—৪টি।

নির্বাচনে ১১৯টি মুসলিম আসনের মধ্যে শেরে বাংলার কৃষক প্রজা পার্টি লাভ করে ৪৩টি এবং মুসলিম লীগ ৩৮টি এ ছাড়াও অনেক নির্দলীয় মুসলমান সদস্য ছিলেন— তাঁরা যে যার সুবিধামতো দলে যোগ দিতে লাগলেন।

এর ফলে মুসলিম লীগের সদস্যসংখ্যা দাঁড়ালো ৬০ আর কৃষক প্রজা পার্টির হল ৫৮। অপর দিকে বর্ণহিন্দু ও তফশিলিদের মধ্যে ৬০ জন ছিলেন কংগ্রেস সমর্থক! এই ৬০ জন শেরে বাংলার দলকে সমর্থন দিলেও তারা জমিদারি উচ্ছেদের নীতিকে সমর্থন করেন না। তাই আসনসংখ্যায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে সমর্থ না হওয়ায় কোনো দলই সরকার গঠন করতে সক্ষম হল না।

এই অবস্থায় মুসলীম লীগ পড়ল সবচেয়ে বিপদে। অতঃপর একদিন খাজা নাজিমুদ্দিন এবং নবাব হাবিবুল্লা এসে আত্মসমর্পণ করলেন শেরেবাংলার কাছে।

—হক সাহেব, আপনি আজ নিজে নতুন পার্টি করলেও আপনি মূলত আমাদেরই লোক।

—তা বটে। হক সাহেব বললেন।

—তা হলে আপনি আমাদের সাথেই কোয়ালিশন করুন।

—বেশ, করতে পারি। কিন্তু এক শর্তে।

আপনারা কৃষক প্রজা পার্টির আদর্শ ও কর্মসূচি জমিদারি উৎখাতে রাজি আছেন, এটা স্বীকার করুন।

—বেশ, আমরা রাজি।

—বেশ, তা হলে আপনারা আসুন আমার সাথে। মুসলিম লীগ আর কৃষক প্রজা পার্টির কোয়ালিশনেই সরকার গঠন করি।

অতঃপর ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে এগারো সদস্যের একুটি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হল। তিনি হলেন প্রধানমন্ত্রী। এই মন্ত্রিসভায় আর যাঁরা যোগ দিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন নবাব হাবিবুল্লা বাহার, খাজা নাজিমুদ্দিন, সৈয়দ নওসের আলি, মিঃ শহীদ সোহরাওয়ার্দি, নবাব মশাররফ হোসেন, মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার, স্যার বি.পি. সিংহরায়, মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী, শ্রী মুকুন্দবিহারী মল্লিক, শ্রীপ্রসন্ন দেবরায় প্রমুখ।

মন্ত্রীদের দফতর বন্টন নিয়ে পড়ে গেল কাড়াকড়ি। কেউ এটা নিতে চান, আরেকজন ও দফতর নিতে চান। কিন্তু শিক্ষা দফতরের কথা কেউ মুখেও আনেন না। ওটার ভার কেউ নিতে রাজি হন না। অবশেষে ওটা হক সাহেবই রাখলেন নিজের হাতে। শিক্ষা দফতরের ভার নিজের হাতে নিতে গিয়ে তিনি স্বভাবসুলভ রসিকতায় বললেন,—

—শিক্ষা দফতর কেন কেউ চাইবে? যাঁরা শিক্ষার জন্য ছেলেমেয়েদের বিলাত, দার্জিলিং, শিলং, প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঠান, শিক্ষা দফতরের কাজে তাঁরা উদাসীন। শিক্ষা দফতরের কাজ আসলে কোটি কোটি গরিব সন্তানের

শিক্ষার কাজ— যে গরিব: সন্তানদের কোনো কোনো সমাজ ধর্মের নামে যুগযুগান্তর থেকে শিক্ষায় বঞ্চিত রেখেছে। নবাব, স্যার, মহারাজ এর উচ্চস্তরে বিহার করে থাকেন, নিচের দিকে তাদের নজর আসতে চায় না। গরিবদের যাঁরা অবজ্ঞা করেন। প্রধানমন্ত্রীর হাজার কাজ; সেই হাজার কাজের মধ্যেও আমি শিক্ষা দফতর নিজের হাতে রাখলাম।

এ বছরই কিন্তু ফজলুল হকের জীবনে ঘটেছিল আরেকটি বিশিস্ট ঘটনা। এই যে হক সাহেবকে 'শেরেবাংলা' বলে ডাকা হয়, এই খেতাবও তিনি এই বছরই প্রথম লাভ করেছিলেন; তখনও তিনি মন্ত্রিত্ব লাভ করেননি।

ভারতের লখনউতে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ঐতিহাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সেখানেও প্রধান বক্তা তিনি। কিন্তু সেখানকার স্থানীয় লোক তো বাংলা জানেন না। ওটা হল উর্দু ভাষাভাষী অঞ্চল। শেরেবাংলা উর্দুতেও কথা বলতে পারতেন অনর্গল। তাই সভায় তিনি উর্দুতেই বক্তৃতা দিলেন। বাঙালি ফজলুল হকের মুখে এমন বিশুদ্ধ উর্দুতে অনলবর্শী, মর্মস্পর্শী ও বীরত্বব্যাঞ্জক বক্তৃতা শুনে লখনউবাসী আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধ্বনি দিয়ে উঠল 'শেরেবাংলা' জিন্দাবাদ। আর সেই থেকেই তিনি সবার কাছে পরিচিত হয়ে আছেন শেরেবাংলা অর্থাৎ বাংলার বাঘ নামে।

নির্বাচনে জয়লাভ করে শেরেবাংলা মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন। নিজেও প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। নির্বাচনের সময় তিনি জনগণকে কথা দিয়েছিলেন— জমিদার-মহাজনদের অত্যাচার থেকে তাদের রক্ষা করবেন।

তখনও জমিদার- মহাজনদের সারাদেশে দোর্দণ্ড প্রতাপ। এদের উৎখাত করা: সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। সমাজের এত বড় দু-দুটো শত্রুকে একসাথে ঘায়েল করা সহজ কথা নয়। একে একে কৌশলে কাজ হাসিল করতে হবে?

মহাজন-জমিদার পরিবৃত মুসলিম লীগ জমিদারি উৎখাতে অঙ্গীকার করে তার মন্ত্রিসভায় প্রবেশ করলেও ব্যাপারটা তারা খুব সহজভাবে মেনে নেবে না। এটা তিনি জানতেন। আর জানতেন বলেই কৌশলের আশ্রয় নিলেন।

তিনি প্রথমে তাঁর কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় ১৯৩৮ সালের ঋণ সালিসি বোর্ড আইন পাস করিয়ে নিলেন এবং এক বছরের মধ্যে ৬০,০০০ ঋণ সালিসি বোর্ড স্থাপন শেষ করলেন। এই বছরেরই শেষের দিকে ঢাকার তেজগাঁয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন কৃষি ইনস্টিটিউট।

১৯৩৯ সালের মধ্যে কৃষক-প্রজার দাবি মোতাবেক পাস হল প্রজাস্বত্ব আইন। আর এই বছরই তিনি কলকাতা মিউনিসিপাল আইন সংশোধন করে করপোরেশনে রূপান্তরিত করলেন এবং পৃথক নির্বাচনপ্রথার প্রবর্তন করলেন।

১৯৪০ সালে পাশ হল মহাজনী আইন। ঋণ সালিসী বোর্ড প্রজাসবত্ব আইন এবং মহাজনি আইন পাস করে দেশের অগণিত কৃষি খাতকদের জীবনে সূচনা করলেন এক নতুন যুগের।

কৃষক-প্রজারা অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পেল। এই জন্যই হক মন্ত্রি-সভার দু'তিন বছরকে বাংলার মুসলমানদের জন্য সাধারণভাবে এবং দেশের কৃষক-প্রজা সাধারণের জন্য বিশেষভাবে 'স্বর্ণ যুগ' নামে অভিহিত করা হয়।

দেশের অগণিত নিঃস্ব দরিদ্র কৃষক-শ্রমিকের জন্য শেরেবাংলার প্রাণের দরদ ছিল অপরিসীম। দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েও গাঁয়ের সাধারণ প্রজার জন্য তার দুয়ার ছিল খোলা। তার লক্ষ্যও ছিল দেশের সাধারণ প্রজার উন্নতি। তিনি দেশের নিঃস্ব প্রজাদের প্রতি কতখানি নিবেদিত প্রাণ ছিলেন তার প্রমাণ মেলে অনেক ছোটখাটো ঘটনার মধ্য দিয়ে।

তখন শেরেবাংলা প্রধানমন্ত্রী। তার বৈঠকখানায় প্রায়ই বসত গল্পের আসর। সেদিনের এক বৈঠকে কথা উঠেছিল রাজনীতি নিয়ে। কথায় কথায় এসেছিল জিন্নাহ ও পণ্ডিত নেহরুর কথা। একজন কথার সূত্র টেনে নিয়ে বললেন, আমাদের হুজুরও তো ইচ্ছে করলে ঐরকম একজন সর্বভারতীয় নেতা হতে পারতেন।

কথা শুনে শেরেবাংলা হেসে বললেন, দেখা রে ভাই, উড়োজাহাজে চড়ে আকাশে উড়লে নিচের মানুষগুলো খুব ছোট দেখায়। তারপর আর উপরে উঠলে

একসময় আর কোনো মানুষই চোখে পড়ে না। আমি যদি সর্বভারতীয় নেতা হয়ে আকাশে উড়ে বেড়াতাম, তা হলে এই মাটির মানুষগুলো আমার চোখেই পড়ত না।

সেই আসরে উপস্থিত ছিলেন পটুয়াখালির একটি গায়ের চাষি। নাম গরিবিউল্লাহ মোড়ল। গাঁয়ে কিছু জমি আছে, তাই চাষাবাদ করে আর টুকটাক ব্যবসা আছে। এই ব্যবসার কাজেই মাঝে মাঝে আসতে হয় কলকাতা। আর কলকাতা এলে হুজুরকে সালাম না দিয়ে যাওয়া হয় না। আজও সে হুজুরকে সালাম দিতে এসেছিল।

কথা শুনে সে-ই বললে, আমাগোর হজুরের অত বড় অইয়া কাম নাই। তিনি আমাগোর মধ্যে না থাকলে ৬০ হাজার ঋণ সালিশি বোর্ড বানাইত কেডায়? আর তার দৌলত ছাড়া কোটি কোটি কৃষক প্রজা জমিদার মহাজনের অত্যাচার থেইক্যা রেহাই পাইলাম কেমনে?

এমনি আছে আর অনেক কাহিনী।

সেবার কলকাতার ধর্মতলা স্ট্রীটস্থ ওয়াছেল মোল্লার দোকানের উপরতলায় বসেছে ঈদ উপলক্ষে ইসলামি গানের আসর বা জলসা। আমন্ত্রিতদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী হক সাহেব, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম আর গায়ক আব্বাসউদ্দিন আহমেদ।

হক সাহেব বললেন, আজ ঈদের জলসা, তা ঈদের গান না হলে কি জমে কাজী?

—তা তো বটেই, হক সাহেবের কথার সমর্থন করলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও।

তখন কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও আব্বাসউদ্দিন দুজনে মিলেই এক সাথে গান ধরলেন—

ঈদ মোবারক, ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক হো...

একসময় গান থামল। তখন পাশের এক লোকের পিঠের উপর এক টুকরো কাগজ নিয়ে হক সাহেব কী যেন লিখতে শুরু করলেন। তারপর লেখা শেষ করে বলতে লাগলেন, আচ্ছা বলে তো কাজী, আমি কী লিখলাম? যদি বলতে পার, তা হলে তোমাকে মিষ্টি খাওয়াব।

কাজী নজরুল ইসলাম বললেন, কী বললেন, আপনি মিষ্টি খাওয়াবেন? তা হলে আমাদের ডাল-ভাত খাওয়াবে কে?

কথা শুনে সকলে হেসে উঠলেন। হাসি থামলে হক সাহেব বললেন, পারলে না তো? তা হলে শোনো।

এই বলে তিনি একটি কবিতা পড়তে শুরু করলেন—

দেখিনু, সেদিন রাত্রে অদ্ভুত স্বপন
শশান মাঝারে এক মহান মানব
বিভূতি ভূষিত।
জিজ্ঞাসিনু তারেঃ কহ তুমি কেবা?
কহিল আমি যে কবি। পৃথিবীর শ্মশানে
আমি গাই সদা জীবনের গান।
—মারহাবা! মারহাবা!!

কবিতা শুনে কাজী নজরুল ইসলাম খুশিতে একেবারে লাফিয়ে উঠলেন। দুহাতে তালি বাজিয়ে বলতে লাগলেন, এ যে চমৎকার একখানা কবিতা। তা আপনি কবিতা লেখেন না কেন স্যার?

হক সাহেব হেসে বললেন, "আমি যদি কবিতা লিখিব, তা হলে তোমাদের ডাল-ভাতের ব্যবস্থা করার জন্য মন্ত্রিত্ব করবে কে?

সাধারণ মানুষের দাবি তার কাছে ছিল সবার উপরে। একজন উচ্চপদস্থ লোক তার কাছে কোনো কাজে গেলে তার সাক্ষাৎ পেতে বরং বেগ পেতে হত,

কিন্তু একজন শ্রমিকের পক্ষে দাবি নিয়ে হক সাহেবের কাছে যাওয়া ছিল খুবই সহজ। একজন শ্রমিক, একজন কৃষক তার কাছে ছিল দেশের অগণিত গণমানুষের অংশবিশেষ। তাই তাদের দাবিও ছিল সবার উপরে।

এমনি একটি ঘটনা ঘটেছিল একদিন। একদিন একদল বাজারের কসাই তার কাছে এল অভিযোগ নিয়ে।

—কী ব্যাপার?

হুজুর, আমরা লুঙ্গি-পাঞ্জাবি পরি বলে আমাদের ‘লাইট হাউস’ সিনেমা হলে ঢুকতে দিল না। হুজুর, আমরা এর বিচার চাই।

তিনি বললেন, বেশ, তোমরা একটু বসো।

এই বলে তিনি বাড়ির ভিতর গেলেন এবং অবিকল কসাইর পোশাক পরে বেরিয়ে এসে বললেন, বেশী।, এবার চলো।

তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়েও এই বেশেই তিন-চারজন কসাইর সাথে সাধারণ সিটে বসে সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরলেন।

সাধারণ মানুষের প্রতি এই যে দরদ, এই দরদই তাকে সারাদেশে করে তুলেছিল অভূতপূর্ব জনপ্রিয় এবং তাঁর এই জনপ্রিয়তা নিয়েও প্রচলিত আছে। এমনি সব হাজারো রূপকথার মতো গল্পকাহিনী!

বরিশাল জেলার ঝালকাঠি থানার নারায়ণপুর গ্রাম। সেই গ্রামেরই বৃদ্ধ চাষি আসরউদ্দিন। দেনার দায়ে মহাজন নালিশ করে তার বিষয়সম্পত্তি সব গ্রাস করেছিল। পরে হক সাহেবের সময় ঋণ সালিশি আইনে সে তার হারানো সম্পত্তি ফেরত পায়। এ কথা আসর- উদ্দিন কোনো দিন ভুলতে পারেনি।

তারপর এল ১৯৫৪ সাল। যুক্ত ফ্রন্টের নির্বাচন, আসরউদ্দিনও গেল ভোটকেন্দ্রে ভোট দিতে। ব্যালট পেপার নিয়ে গেল নির্দিষ্ট কামরায়; কিন্তু সে তো আর ভোট দিয়ে ঘর থেকে বেরোয় না।

শেষে প্রিসাইডিং অফিসার ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখে লোকটা নৌকা‌মোর্কা বাক্সটা বুকে জড়িয়ে ধরে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে কাঁদছে আর বলছে, হক বাবা, তোর দেনা আমি শোধ করে গেলাম। তুই আমারে খালাস দে।

শোনা যায় দেশের কৃষক প্রজার মঙ্গলের জন্য যখন তিনি জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ করার জন্য কোমর বেঁধে লেগেছিলেন, তখন তাঁকে নিবৃত্ত করার জন্য বাংলার জমিদার সমিতি থেকে কলকাতার গোড়াচাঁদ রোডের বাড়িতে নগদ এক কোটি টাকা দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছিল। এই প্রস্তাব শুনে তিনি ঘৃণাভরে বলেছিলেন, আদর্শ বেচে খাওয়া আমার পেশা নয়।

শেরেবাংলার সততা ও কর্তব্যনিষ্ঠার গল্প এগুলো যেন অ্যাজ সত্যি রূপকথার গল্পের মতো শোনায়। অথচ এ ছিল নির্ভেজাল সত্যি। বর্ণে-বর্ণে সত্যি এবং খাঁটি।

শেরে বাংলা প্রধানমন্ত্রী হলেও তার হাতে ছিল শিক্ষা দফতরের ভার। তার আমলে দেশের শিক্ষার ক্ষেত্রেও অনেক অগ্রগতি সাধিত হয়।

তিনি বাংলার অবহেলিত শিক্ষাব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নতির জন্য গঠন করেন 'মাওলা বক্স কমিটি'। এই কমিটির রিপোর্ট অনুসারেই দেশে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রবর্তিত হয়। তখন থেকেই পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত দেশে অবৈতনিক শিক্ষা চালু করা হয়। আজও সেই ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। এটা শেরেবাংলারই অমর কীর্তি।

শেরেবাংলা প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীনই কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় লেডি ব্রাবোর্ন কলেজ এবং এই কলেজের বাংলাবিভাগের প্রধান হিসেবে নিয়োগ করা হয় সুলেখিকা বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদকে। উল্লেখ্য যে, তখনও বেগম শামসুন্নাহার এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেননি।

কলকাতায় বেগম রোকেয়ার প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলটি দীর্ঘদিন ধরে অবহেলায় পড়েছিল। শেরেবাংলা স্কুলটিকে প্রাদেশিক সরকারের পরিচালনাধনে এনে এর উন্নতি করেন।

১৯৪০ সালের এক উপনির্বাচন উপলক্ষে তিনি ঢাকা আসেন। এই সময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস ফজলুল হক মুসলিম হলের ভিত্তি স্থাপন করেন।

এটা যে সময়ের কথা, তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ভিতর হক সাহেবের বিরোধী অনেক লোক ছিল। তাঁরা চাইছিলেন না হলটির নাম ফজলুল হকের নামে হা‌েক। তারা এর নামকরণ করতে চেয়েছিল নতুন মুসলিম হল।

অনেকে বিরোধিতা করলেও ছাত্রদের মধ্যে শেরেবাংলার জনপ্রিয়তা এত বেশি ছিল যে কুচক্রিরা সুবিধা করতে পারল না। ছাত্রদের প্রবল চাপে হলটির নাম অবশেষে 'ফজলুল হক মুসলিম হল' রাখতে বাধ্য হলেন।

সে বছরই হক সাহেব প্রতিষ্ঠা করলেন ঢাকার মুন্সিগঞ্জে হরগঙ্গা কলেজ, মালদহ জেলার (বর্তমানে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে) আদিনা ফজলুল হক কলেজকে সরকারি মঞ্জুরি দান করা হল, শেরেবাংলার নিজ গ্রাম চাখারে প্রতিষ্ঠিত হল চাখার ফজলুল হক কলেজ।

এসব ছাড়াও সে বছর হক সাহেবের সবেচেয় উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল দৈনিক নবযুগ পত্রিকার পুনঃপ্রকাশ। এটি দ্বিতীয় দফায় প্রকাশিত হয়েছিল বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সম্পাদনায়। এ ছাড়াও এতে রইলেন আবুল মনসুর আহমদ, সৈয়দ বদরুদ্দোজ, নান্না মিয়া (সৈয়দ আজিজুল হক)) ও ওয়াহিদুজ্জামান (ঠাণ্ডা মিয়া) প্রমুখ। হক সাহেবের পৃষ্ঠপা‌েষকতায় প্রকাশিত 'নবযুগ' সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে প্রখ্যাত সাংবাদিক সাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমদ বলেছেন,—

'যথাসময়ের একটু আগে পিছে ১৯৪০ সালের অক্টোবর মাসে ধুমধামের সা‌েথ 'নবযুগ' বাহির হইল। জোরদার সম্পাদকীয় লিখিলাম। সোজাসুজি মুসলিম লীগ বা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কিছু বলিলাম না; মুসলিম বাংলার বাংলা দৈনিকের আধিক্যের প্রয়োজনের উপরেই জোর দিলাম! তোখড়

সম্পাদকীয় হইল এমনি জোরের সম্পাদকীয় চলিতে লাগিল। সবাই বাহ বাহ করিতে লাগিল।'

সে বছরেই অর্থাৎ ১৯৪০ সালের ২২ মার্চ শেরেবাংলা পেশ করলেন তার ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব। শেরেবাংলা তাঁর এই প্রস্তাবে বললেন,—

—"লিখিল ভারত মুসলিম লীগ তথা এদেশের কয়েক কোটি মুসলমান দাবি করছে যে— যেসব এলাকা একান্তভাবেই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ, যেমন উত্তর পশ্চিম সীমান্ত এলাকা এবং ভারতের পূর্বাঞ্চল, প্রয়োজন অনুযায়ী সীমানার রদবদল করে ঐ সকল এলাকাকে ভৌগোলিক দিক দিয়ে এরূপভাবে পুনর্গঠিত করা হাে যাতে তারা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র 'ষ্টেটস'-এর রূপ পরিগ্রহ করে ও সংশ্লিষ্ট ইউনিটদ্বয় সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌমত্বের মর্যাদা লাভ করতে পারে।'

লাহাের সম্মেলনে শেরেবাংলার পেশকৃত প্রস্তাবের এটাই ছিল মূল কথা। কিন্তু পরে দিল্লি কনভেনশনে বাংলাদেশবিরোধী নেতৃবৃন্দ এই ঐতিহাসিক লাহাের প্রস্তাবকে শব্দগত ভুল বলে ধরে নিয়ে নতুন করে সংশোধনি এনে একরাষ্ট্র গঠনের দাবি প্রতিষ্ঠা করেন।

শেরেবাংলার এই লাহোর প্রস্তাবের মধ্যে বাঙালি জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের বীজ নিহিত ছিল বলেই তিনি এ প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। এ কারণেই লাহাের প্রস্তাবকে বাংলাদেশের জাতীয় চেতনায় মূল উৎস বলা হয়ে থাকে।

সে বছরেরই সেপ্টেম্বর মাসে নেতাজি সুভাষ বসুর নেতৃত্বে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের আন্দোলন শুরু হয়। এ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন ছিল তাঁর। শুধু সমর্থন নয়— তিনি শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বক্তৃতাদানকালেই এ্ মনুমেন্ট ভেঙে ফেলার অদেশ দেন।

১৯৪১ সালে শেরেবাংলার সঙ্গে মুহম্মদ আলি জিন্নাহর আদর্শগত মতপার্থক্য তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে এবং একসময়ে তিনি মুসলিম লীগের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বের হয়ে আসেন।

১৯৪১ সালে ভারতের ভাইসরয় ছিলেন লর্ড লিনলিথগো (Lard Marques of Linli thgow) ভারতকে রক্ষা করার জন্য তিনি একটি সমর পরিষদ বা 'ওয়ার কাউন্সিল' (war Council) গঠন করেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি পদাধিকার বলেই এই পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ওয়ার কাউন্সিলের সদস্যপদ গ্রহণ নিয়েই জিন্নাহর সঙ্গে শেরেবাংলার মতানৈক্যের সৃষ্টি হয় এবং পরে শেরেবাংলা মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করেন।

পরে অবশ্য শেরেবাংলাও ১৮ অক্টোবর ওয়ার কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ করেন। তবে এর আগেই তিনি মুসলিম লগি থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন।

মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করার সময় তিনি মুহম্মদ আলি জিন্নাহর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনেন তা হল—

১. সভাপতির কার্যক্রম গঠনতন্ত্র মতে একেবারেই অগণতান্ত্রিক।

২। কার্যকরী কমিটির সামনে বিকল্প কোনো পথ না থাকার জন্যই কার্যকরী কমিটির সভাপতির কার্যক্রম মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন কারণ কার্যকরী কমিটি যদি সভাপতির কার্যক্রম অনুমোদন করতে অস্বীকার করতেন, তবে তা সভাপতির বিরুদ্ধে অনাস্থ্য ভোট বলেই গণ্য হত, অথচ কার্যকরী কমিটি তখন এই অচলবস্থার সম্মুখীন হতে আদৌ প্রস্তুত ছিল না।

৩. পদ্ধতির প্রশ্নে মুসলমান সংখ্যালঘুর অধ্যুষিত প্রদেশগুলোর নেতাদের মারফতে তিনি কায়দামাফিক এমন একটা প্রতিবাদ উত্থাপন করেছেন যে, তার ফলে বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবের স্বার্থ ব্যাহত হচ্ছে।

৪. নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি তাঁর উপর অর্পিত গুরু দায়িত্ব গঠনতান্ত্রিকতা ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্নভাবে সম্পাদন করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছেন।

৫. গণতন্ত্র ও স্বাধীকারের মূলনীতিসমূহ এক ব্যক্তির একতরফা ইচ্ছা-অনিচ্ছার নিকট এমনভাবে বিসর্জন দেয়া হয়েছে যে, তিনি সর্বক্ষমতাসম্পন্নতায় বাংলাদেশের তিন কোটি ত্রিশ লাখ (তখনকার হিসেব অনুযায়ী) বাঙালি মুসলমানের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে চাচ্ছেন, যারা গোটা ভারতীয় মুসলমান রাজনীতিতে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই মুসলিম লীগের সমর্থন হারিয়ে বাংলাদেশে কৃষকপ্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগের কোয়ালিশন সরকারের পতন ঘটে।

অতঃপর শেরেবাংলা ১৯৪১ সালের ১৬ ডিসেম্বর হিন্দু-মহাসভার শক্তিশালী নেতা শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সহযোগিতায় নতুন মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন। কিন্তু এই মন্ত্রি পরিষদও বেশি দিন স্থায়ী হল না।

১৯৪২ সালে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে শুরু হল ‘ভারত ছাড়’ আন্দোলন : সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে এ আন্দোলনের ঢেউ। শেরেবাংলা নিজেও সমর্থন করলেন এ আন্দালেনকে। আর এই নিয়েই বাংলাদেশের ইংরেজ গভর্নর হার্বাটের সঙ্গেও তাঁর দেখা দিলো মতপার্থক্য।

অবশেষে ১৯৪৩ সালের ২৮ মার্চ তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করলেন।

৫. যুক্তফ্রন্ট ও শেরেবাংলা

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ভারতের ইতিহাস এক নতুন দিকে মোড় নিল। দুশো বছর আগে বাংলার পলাশির প্রান্তরে এক ঘৃণ্যতম বিশ্বাসঘাতকতার মধ্য দিয়ে এদেশে যে ঔপনিবেশিক শাসনের শুরু হয়েছিল তার অবসান ঘটল। ভারতের বুকের উপর থেকে দুশো বছরের চেপে থাকা ব্রিটিশশাসনের জগদ্দল পাথরটা সরে গেল। জন্ম নিল দুটো স্বাধীন রাষ্ট্র— ভারত এবং পাকিস্তান।

এর মধ্যে পাকিস্তান নামের এই রাষ্ট্রটির ভৌগোলিক আকৃতি হল বড় বিচিত্র। এক পাকিস্তান হয়েছিল দুটো দেশ নিয়ে, যার এক অংশ থেকে আরেক অংশের দূরত্ব প্রায় দেড় হাজার মাইল (২৪০০ কিলোমিটার)।

এ দুটো দেশে অবস্থানকারী মানুষের ভাষা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির সঙ্গে পরস্পরের কোনো মিল না থাকলেও শুধু বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় ঐক্যের জন্য জিন্নাহ সৃষ্ট দ্বিজাতিতত্ত্বের আওতায় তাঁরা হয়ে গেল এক জাতি। এর এক অংশের বাসিন্দারা অন্য অংশের লোকদের চেনে না, তাদের ভাষা বোঝে না, তবু একদেশের নাগরিক।

অথচ শেরেবাংলা কিন্তু এটা চাইছিলেন না। তার ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবে তিনি ভারতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে মুসলিম দেশ গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সে হিসেবে সাবেক পূর্ব পাকিস্তান ও একটি মুসলিম দেশ হবে। তা কোনোমতেই পশ্চিম অংশের লেজুড়বৃত্তি করবে না। হবে একটি স্বাধীন দেশ— যা বহু পরে অনেক রক্তের বিনিময়ে বাস্তবায়িত হয়েছে। এটাই ছিল তাঁর প্রস্তাবের মূল বক্তব্য।

কিন্তু তাঁর প্রস্তাব বাস্তবায়িত হয়নি। শুধু হয়নি নয়, এই নিয়েই পরবর্তীকালে পাকিস্তানের জাতির জনক নামে খ্যাত মুহম্মদ আলি জিন্নাহর সঙ্গে শেরেবাংলার মতানৈক্য হয় এবং তিনি মুসলিম লীগ ত্যাগ করেন। তাই স্বাভাবিক কারণেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার লগ্নে তিনি কিছুটা কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন। কারণ জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বের আওতায় পাকিস্তান হাসেলের সংগ্রামে মুসলিম লীগের ছিল মুখ্য ভূমিকা; আর তিনি ছিলেন মুসলিম লীগের বিরোধী। যদিও এদেশ থেকে ব্রিটিশশাসনের অবসান ঘটানোর সংগ্রামে তাঁর দানও ছিল অনস্বীকার্য।

তাই দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি কলকাতা ছেড়ে ঢাকা আসার পরও এদেশের সরকারগঠনে তার কোনো ডাক পড়েনি। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ যুক্তফ্রন্ট গঠনের আগ পর্যন্ত

শেরেবাংলা ছিলেন সক্রিয় রাজনীতি থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন। অনেকটা নির্বাসিত জীবন-যাপন করছিলেন তিনি এই পাঁচটি বছর। মুসলিম লীগের প্রতিটি নেতাই যেন তখন ছিলেন প্রায় বিজয়ী বীর। ভাবখানা তাঁদের তা-ই ছিল তখন।

দীর্ঘ স্বেচ্ছানির্বাসনের পর শেরেবাংলা প্রথম জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করেন ১৯৫৩ সালে। আবদুল হামিদ খান ভাসানীর মুক্তির দাবিতে ঢাকার আরমানিটোলা ময়দানে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সভারই প্রধান বক্তা ছিলেন শেরেবাংলা ফজলুল হক। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জনসভায় এই তাঁর প্রথম বক্তৃতাদান।

এসময় তিনি ফিরে গিয়েছিলেন আবার তার সেই পুরনো পেশা ওকালতিতে, সে সময় তিনি ছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অ্যাডভোকেট জেনারেল।

শেরেবাংলা এই প্রতিবাদ সভায় দীর্ঘদিন পর মানের সমস্ত আবেগ তার অনুভূতি ঢেলে বক্তৃতা দিলেন। আবার বাংলার মানুষ শুনতে পেল সেই বলিষ্ঠ কণ্ঠ, আবার দেশের সাধারণ মানুষ দুচোখ ভরে দেখতে পেল তাদের প্রিয় নেতাকে। আবার তারা ফিরে পেল তাদের দরদি বন্ধুকে।

আত্মপ্রকাশ যখন একবার হল তখন আর থামলেন না তিনি। আর ফিরে গেলেন না ঘরে; তিনি যেন আবার শুনতে পেলেন মানুষের ডাক। তাঁর কৃষক-বন্ধু, শ্রমিক-বন্ধু আর নিঃস্ব মানুষের করুণ কান্না ভেসে এল তার কানে। তারা যে আবার তাকে ডাকছে! তিনি কি সে ডাকে সাড়া না দিয়ে পারেন?

এ বছরেরই ২২ মার্চ তার ঢাকাস্থ ২৭ নং কে. এম. দাস লেনস্থ বাসভবনে ডাকলেন এক সর্বদলীয় সম্মেলন।

অনেক প্রগতিশীল নেতার সাথে হল রাজনৈতিক সমঝোতা। তিনি ঠিক করলেন আবার ফিরে আসবেন সক্রিয় রাজনীতিতে। অতঃপর নেয়া হল রাজনৈতিক কর্মসূচি।

তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন খাজা নাজিমুদিন। মার্চ মাসের মধ্যে পাকিস্তানে একটি সাধারণ নির্বাচনদানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে দিলেন একটি খোলা চিঠি। কারণ, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এখানে আর নির্বাচন হয়নি। একটি স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠান দাবি করার অধিকার জনগণের অবশ্যই আছে।

জনাব খাজা নাজিমুদ্দিন

সময় সময় শত্রু হলেও আমি আপনার পুরনো বন্ধু এবং আপনার খাঁটি শুভার্থী! পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপনা পরিষদের সাধারণ নির্বাচন কখন হবে? সেই সম্পর্কে শীঘ্রই একটা ঘোষণা প্রচারের জন্য কি আমি আপনাকে অনুরোধ করতে পারি? আপনি ভাল করেই জানেন যে, এই নির্বাচনের সময় অনেকদিন পূর্বেই উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। খুব বেশি দেরি করলেও ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসের মধ্যেই এই নির্বাচন অনুষ্ঠান করা উচিত। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, অবস্থা দেখে মনে হয়, সরকার এ সম্পর্কে এখনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হননি। তাই এ কারণেই নির্বানের সম্ভাব্য তারিখ সম্পর্কে কোনো ঘোষণা করতেও তারা প্রস্তুত নন। শুধু সরকারের বিষয় নয়, জনসাধারণের পক্ষেও এটা বড়ই আফসোসের বিষয়।

আইন পরিষদের মন্ত্রিদের যথারীতি বিধিসম্মত পাঁচ বছরের মেয়াদের বেশি সময় সুবিধা ভোগ করার কোনো অধিকার নেই। তাদের এবং সদস্যদের যেমন নির্দিষ্ট মেয়াদের পর পদ দখলের কোনো অধিকার নেই, সেরূপ ভোটদাতাদেরও সদস্য ও তাদের প্রতি আস্থা অথবা অনাস্থা পূর্বক মতপ্রকাশের সুযোগ গ্রহণ করার অলঙ্ঘনীয় অধিকার রয়েছে। উপযুক্ত কারণ ছাড়া

ভোটাতাগণকে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। পূর্ববঙ্গে এরূপ জোর জল্পনা-কল্পনা চলছে যে, কোনো একটা ছুতানাতায় সরকার এ নির্বাচন মুলতবি রাখার চেষ্টা করছে। নির্বাচনের প্রস্তুতির ব্যাপারে সরকারের এরূপ চরম নিরুৎসাহের ভাব এ জল্পনা-কল্পনা বিস্তৃতি লাভ করতে সহায়তা করছে। আপনাকে এটা নিশ্চিত বলতে পারি যে, সরকার যদি কোনো কারণে নির্বাচন স্থগিত রাখে তবে দেশবাসীর মনে এ ধারণাই জন্মাবে যে, পরিষদের বর্তমান সদস্যবৃন্দ এবং বিশেষ করে মন্ত্রীদের পােষণ করার জন্যই সরকার নিয়ম লঙন করছে।

আমাদেরকে নির্বাচনের সুযোগ দেয়া হবে কি না, সে সম্পর্কে যত শীঘ্র সম্ভব একটা ঘোষণা প্রচারের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। এ প্রসঙ্গে আমি আপনাকে এটাও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, পাকিস্তানের অন্যান্য সকল প্রদেশেই সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন হয়ে গেছে। সুতরাং এই প্রদেশের অধিবাসীদের এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কোনো কারণ থাকতে পারে না।

আপনাকে আমি এ কারণে চিঠি লিখছি যে, সরকার যদি নির্বাচনের প্রশ্নটিকে ফেলে রাখতে চায়, তবে নির্বাচনের দাবিতে সারা দেশব্যাপী আমাদেরকে গণআন্দোলন শুরু করতে হবে। কিন্তু এই চরম অবস্থা অবলম্বন করার আগে আমরা সরকারকে দেশবাসীর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার সুযোগ দিতে চাই; যেহেতু বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর সাথে জনসাধারণের স্বার্থ গভীরভাবে জড়িত, সেই হেতু এর এক কপি অনুলিপি আমি সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্যও দিলাম। আপনার সর্বাঙ্গণ কল্যাণ কামনা করি ইতিঃ

ভবদীয়

(স্বাঃ) এ. কে. ফজলুল হক।

এই বছরই তিনি পূর্ববাংলা সরকারের অ্যাডভোকেট জেনারেল-এর সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে পুনরায় সরাসরি রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। ১৯৫৩

সালের ৮ আগস্ট ঢাকা বার অ্যাসোসিয়েশন হলে আইনজীবী সমিতির এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনের উদ্বোধন করতে গিয়ে পূর্ববাংলার বাঙালিদের উপরে পশ্চিম পাকিস্তানি আমলা ও স্বৈরাচারের শোষণ ও অত্যাচারের কাহিনী তুলে ধরলেন। তিনি বললেন, 'পাকিস্তান হল, কিন্তু কেন্দ্র স্থাপিত হল বৃত্তের উপরে।'

শেরেবাংলা পুনরায় রাজনীতিতে নেমেই নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নতুন করে গঠন করলেন তাঁর কৃষক-শ্রমিক পার্টি। কৃষক প্রজা পার্টিই রূপান্তরিত হলো কৃষক-শ্রমিক পার্টিতে। ১৯৫৩ সালের ২৭ জুলাই আবদুল লতিফ বিশ্বাসকে সম্পাদক করে কৃষক-প্রজা সমিতিকেই সময়োপযোগী করে কৃষক-শ্রমিক দল পুনর্গঠন করলেন।

শেরেবাংলার নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করাতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেখা দিল এক নতুন সম্ভাবনা। জনগণের মনে সঞ্চারিত হল নতুন আশা। চারদিকে পড়ে গেল জয়-জয়কার। ইতোমধ্যেই একদিন হাােসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দি এবং মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এসে অনুরোধ জানালেন একটি যুক্তফ্রন্ট গঠন করার জন্য।

অবশ্য প্রথম দিকে শেরেবাংলা যুক্তফ্রন্ট গঠনে রাজি ছিলেন না। কিন্তু দেশের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের অনুরোধে পরে সম্মতি দিলেন। অবশেষে ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর ২১ দফা দাবির ভিত্তিতে হক-ভাসানী- সোহরাওয়ার্দি-নেতৃত্বে গঠিত হল ঐতিহাসিক যুক্তফ্রন্ট। দেশের সাধারণ কৃষক-শ্রমিক সানন্দে গ্রহণ করুল যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচি। তারা তৈরি হল এর সপক্ষে রায় ঘোষণা করার জন্য। শেরেবাংলা ঐতিহাসিক যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচি, যা ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে সারা দেশে বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল— তার বিবরণ নিচে দেয়া হল —।

১। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হবে।

২। বিনয় ক্ষতিপূরণে জমিদারি ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উচ্ছেদকৃত জমি বিতরণ করা হবে;

উচ্চহারে খাজনা ন্যায়সঙ্গতভাবে হ্রাস করা হবে এবং সার্টিফিকেট যোগে খাজনা আদায়ের প্রথা রহিত করা হবে।

৩। পাট ব্যবসাকে জাতীয়করণ করত পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে এনে পাটচাষিদের পাটের ন্যায্য মূল প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা হবে এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা আমলের পাট কেলেঙ্কারির তদন্ত করে সংশ্লিষ্ট সকলের শাস্তির ব্যবস্থা ও তাদের অসুদপায়ে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৪। কৃষির উন্নতির জন্য সমবায় কৃষিব্যবস্থার প্রবর্তন করা হবে এবং সরকারি সাহায্য সকলপ্রকার কুটির ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন করা হবে।

৫। পূর্ব পাকিস্তানকে লবণশিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য সমুদ্র উপকূলে কুটিরশিল্পে ও বৃহৎশিল্পে লবণ তৈরির কারখানা স্থাপন করা হবে এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা আমলের লবণ কেলেঙ্কারি সম্পর্কে তদন্ত করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে ও তাদের অসুদপায়ে অর্জিত যাবতীয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৬। খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করে দেশকে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের হাত থেকে রক্ষা করা হবে।

৭। পূর্বপাকিস্তানকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পায়িত করে ও কৃষিকে আধুনিক যুগোপযোগী করে শিল্প ও খাদ্যে স্বাবলম্বী করা হবে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমসংঘের মূলনীতি অনুসারে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সামাজিক প্রভৃতি সকলপ্রকার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হবে।

৮। শিল্প ও কারিগর মোহাজেরদের কাজের আশু ব্যবস্থা করা হবে।

৯। দেশে একযোগে প্রাথমিক অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করা হবে এবং শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হবে।

১০। শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করত শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক ও কার্যকরি করে কেবলমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হবে এবং

সরকারি বেসরকারী স্কুলসমূহের বর্তমান প্রভেদ দূর করত একই পর্যায়ভুক্ত করে সকল স্কুলকে সরকারী সাহায্য পুষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হবে এবং শিক্ষকদের জন্য উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হবে।

১১। 'ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন' প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল কানুন বাতিল ও রহিতপূর্বক বিশ্ববিদ্যালয়মূহকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে উচ্চশিক্ষাকে সস্তা ও সহজলভ্য করা হবে এবং ছাত্রাবাসের অল্প ব্যয়সাধ্য ও সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করা হবে।

১২। শাসনব্যয় সর্বাত্মকভাবে হ্রাস করা হবে এবং এতদুদ্দেশ্যে উচ্চ বেতনভোগী সমস্ত সরকারি কর্মচারীকে বেতন কমিয়ে ও নিমা বেতনভোগী কর্মচারীদের বেতন বাড়িয়ে তাদের আয়ের একটি সুসংগত সামঞ্জস্য বিধান করা হবে। যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীরা এক হাজার টাকার বেশি বেতন গ্রহণ করতে পারবেন না।

১৩। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও ঘুষ রিসাওয়াত বন্ধ করার কার্যকর ব্যবস্থা করা হবে। এবং এতদুদ্দেশ্যে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি পদাধিকার ও ব্যবসায়ীর ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত আয়-ব্যায়ের হিসাব-নিকাশ নেওয়া হবে এবং সন্তোষজনক কৈফিয়াত দিতে না পারলে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

১৪। ‘জন নিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স’ প্রভৃতি কালাকানুন বাতিল ও রহিত করতঃ বিনা বিচারে আটক সমস্ত বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হবে ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রকাশ্য আদালতে বিচারের ব্যবস্থা করা হবে এবং সংবাদপত্র ও সভাসমিতি করার অধিকার অবাধ ও নিরঙ্কুশ করা হবে।

১৫। বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগকে পৃথক করা হবে।

১৬ যুক্তফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রী বর্ধমান হাউসের বদলে অপেক্ষাকৃত কম বিলাসের বাড়িতে অবস্থান নির্দিষ্ট করবেন এবং বর্ধমান হাউসকে আপাতত ছাত্রাবাস ও পরে বাংলাভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা হবে।

১৭। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে যারা মুসলিম লীগ সরকারের গুলিতে শহিদ হয়েছেন, তাদের পবিত্র স্মৃতির চিহ্নস্বরূপ ঘটনাস্থলে একটি শহিদ মিনার নির্মাণ করা হবে এবং তাদের পরিবারবর্গ উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে।

১৮। ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'শহিদ দিবস' ঘোষণা করে দিনটিকে ছুটির দিন বলে স্বীকৃত করা হবে।

১৯। ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্বপাকিস্তান স্বশাসিত ও সার্বভৌম করা হবে এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রাব্যবস্থা ব্যতীত অন্য সমস্ত বিষয় এবং ক্ষমতাসমূহ পূর্ব পাকিস্তানের হাতে আনয়ন করা হবে এবং দেশরক্ষা বিভাগের স্থলবাহিনীর হেড কোয়ার্টার পশ্চিম পাকিস্তানে ও নৌবাহিনীর হেড কোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন এবং অস্ত্র তৈরির কারখানা নির্মাণ করত পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হবে।

২০। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা কোনো অজুহাতেই আইন পরিষদের মেয়াদ বাড়াবে না। আইন পরিষদের মেয়াদ শেষ হবার ছমাস পূর্বে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ইলকশনের ব্যবস্থা করবে।

২১। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার আমলে পরিষদের কোনো সদস্যপদ খালি হলে তিন মাসের মধ্যে তা পূরণের জন্য উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করবে এবং পর পর তিনটি উপনির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী পরাজিত হলে মন্ত্রিপরিষদ পদত্যাগ করবে।

সরকার ঘোষণা করল নির্বাচনের কথা। নির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত হল ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে।

শেরেবাংলা এবারও তাঁর চিরসাথি দেশের অগণিত কৃষক-শ্রমিকের হাত ধরে নামলেন নির্বাচনি যুদ্ধে। ঘুরে বেড়াতে লাগলেন সারা দেশের আনাচে-কানাচে গ্রামেগঞ্জে, নগরে-বন্দরে।

অপরদিকে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ চক্র ও শেরে বাংলার যুক্তফ্রন্টকে মোকাবিলা করার জন্য তৈরি হল। তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিপতিরা প্রকাশ্যেই হকবিরোধী দলগুলোকে, বিশেষ করে মুসলিম লীগকে সাহায্য করতে লাগলেন। দিতে লাগলেন সর্বপ্রকার সহযোগিতা।

পশ্চিমা পুঁজিপতিদের অন্যতম সেরা ব্যক্তি ইস্পাহানি তো নিজেই ছিলেন মুসলিম লীগের কোষাধ্যক্ষ। তার চেষ্টা, প্রভাব আর কৌশলেই মিস ফাতেমা জিন্নাহকে আনা হল পূর্ব পাকিস্তানে। আনা হল যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে নির্বাচনি প্রচার চালানোর জন্য। মিস ফাতেমা জিন্নাহ ঢাকা এসে অবস্থান নিলেন ইস্পাহানিরই গৃহে।।

পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশনের (পি. আই. ডি. সি.) তদানীন্তন চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক দেশের পুঁজিপতি ও শিল্পপতিদের কাছ থেকে প্রভাব খাটিয়ে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে যোগান দিতে লাগলেন লীগ তহবিলে।

শুধু তা-ই নয়, প্রধানমন্ত্রী বগুড়ায় মোহাম্মদ আলি নিজেও নামলেন মুসলিম লীগের পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণায়। সরকারি অর্থ ব্যয় করে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানেই বাছাবাছা লীগ পাণ্ডাদের নিয়ে স্পেশাল ট্রেনে, চার্টার্ড স্টীমারে চড়ে তাঁরা দেশে লগের পক্ষে প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন।

শেরেবাংলার তো আর সরকারি গাড়ি ঘোড়া নেই! তিনি আর কী করেন! গাঁয়ের পথে পায়ে হেঁটে, গরুর গাড়িতে চড়ে নিজের নৌকা মার্কা প্রতীক নিয়ে ছুটে বেড়াতে লাগলেন দিনরাত।

শেরেবাংলা যেখানেই যান লোকে লোকরণ। কোথায় শেরেবাংলা বক্তৃতা দেবেন, শুনলেই চারপাশের দশ গাঁয়ের লোক তাদের কাস্তে কোদাল ফেলে ছুটে

আসে হাজারে হাজারে। ছুটে আসে তাদের প্রিয় নেতাকে এক নজর দেখার জন্য। তার কথা শোনার জন্য।

তিনি কখন হালকা হাস্যরসে, কখন গুরুগম্ভীর কথায় কিংবা কখন ব্যাঘ্রগর্জনে হুংকার দিয়ে ওঠেন মঞ্চের উপর। আর সেইসাথে মাঠের জলকাদায় অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়ে থাকা লাখো জন তার কণ্ঠে ও ধ্বনিত হয়। গগন বিদারি সুর-শেরেবাংলা জিন্দাবাদ, শেরেবাংলা জিন্দাবাদ।

তিনি বক্তৃতা দিতে গিয়ে অপূর্ব কৌশলে, হাস্যরসের মধ্য দিয়ে কেমন মজাদার গল্প বানিয়ে শ্রোতাদেরকে মাত করে তুলতে পারতেন তার কয়েকটি নমুনা তুলে ধরছি। তারিখ ১৩ নভেম্বর, ১৯৫৩। শেরেবাংলার নির্বাচনি সভ্য হচ্ছিল সীতাকুণ্ডের কাছে এক গাঁয়ের স্কুলের মাঠে, বিরাট সভা অগণিত লোক। সবাই এসেছে শেরেবাংলার বক্তৃতা শুনতে।

সভার মধ্যে ঘটেছিল আরেক ফ্যাসাদ। সভার চারপাশে মুসলিম লীগের পাণ্ডারা ঘুরঘুর করে ফিরছিল। কখনও মুসলিম লীগের নামে, কখন শেরেবাংলার বিরুদ্ধে চিৎকার করে স্লোগান ও দিচ্ছিল। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, ওরা কোনো একটা গোলমাল বাঁধিয়ে সভা ভন্ডুল করার মতলবে আছে।

ব্যাপারটা লক্ষ করলেন শেরেবাংলা নিজেও অবশেষে তিনি বক্তৃতা দিতে উঠে সমবেত শ্রোতাদের লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, ভাইসব, লীগের বন্ধুদের এই চিল্লাচিল্লি শুনে আমার একটা মজার গল্প মনে পড়ে গেল; গল্পটা বলছি, আপনার মন দিয়ে শুনুন।

এক গাঁয়ে ছিল এক মোড়ল । একসময় তার অবস্থা খুব ভাল ছিল। গোয়ালভরা গরু, গোলা েভরা ধান, আর ছিল সিন্দুক বোঝাই টাকা।

কিন্তু এখন তার কিছুই নেই। গোয়াল আছে, কিন্তু গোয়ালে গরুড় নেই, গোলা আছে, কিন্তু গোলায় ধান নেই, সিন্দুক আছে, কিন্তু তা শূন্য।

তারপর হল কি—

শুনে গাঁয়ের লোকেরা ছুটে এসে বললে, কিগো মোড়ল, চোরে কী কী নিল তোমার? একেবারে সব নিয়ে গেছে বুঝি? সর্বনাশ করেছে?

মোড়ল উত্তরে বললে, কী আছে আমার ঘরে? আর কী-ই-বা বেবে!

কথা শুনে পাড়ার লোকেরা অবাক হয়ে বলল, কিছুই যখন নেবার নেই, তা হলে চেঁচাচ্ছ কেন অমন করে?

উত্তরে মোড়ল বলল, বুঝলে না, আমি তো কিছু নেওয়ার জন্য কাঁদছিনে। বাইরের চোরও যে জেনে গেল আমার ঘর খালি, আমি যে সেই দুখেই কাঁদছি।

তখন একজন শ্রোতা দাঁড়িয়ে বলল, হুজুর, আপনার এ কিস্‌সার মানে কী?

হক সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, বুঝলে না? মুসলিম লীগের লোকের দেশটাকে চুষে খেয়ে একেবারে খোলা করে দিয়েছে। এটা এখন শূন্য গোলা। আমরা ক্ষমতায় গেলে সেই গোমরও যদি ফাঁস হয়ে যায়, এই ভয়েই ওরা আমাদের সভা করতে দেখলেই ডরায়। লীগের পাণ্ডারা চিল্লাচিল্লি শুরু করে।

আর আমনি হুংকাের দিয়ে সভায় লাখো মানুষের কণ্ঠ গর্জে উঠল, যুক্তফ্রন্ট জিন্দাবাদ, আমরা মুসলিম লীগকে আর দেশ শোষণ করতে দেব না, দেব না।

আর একদিন এমনি এক নির্বাচনি জনসভায় গল্প বলেছিলেন তিনি— একজন জিজ্ঞাসা করল, ভাই, বিয়াবাড়ি গিয়া খাইলা কী? পাইলা কী, দিলা কী? তার উত্তর হল-খাইলাম মাইর, পাইলাম দুক্ষু, দিলাম, দৌড়। মুসলিম লীগের শাসন আমলে দুধেভাতে খেয়ে আমাদের অবস্থাও ঠিক তেমনি হয়েছে।

একদিন কোনো এক নির্বাচনি এলাকা থেকে সেই অঞ্চলের প্রার্থীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এল। সেই এলাকারই কয়েকজন লোক এসে শেরেবাংলাকে বললে, হুজুর, আমাদের নির্বাচনি এলাকায় এ কেমন লোক দিলেন? লোকটা একেবারে অকর্মা। ওকে নৌকায় নিলে পানি সেচা ছাড়া আর কোনো কাজই করতে পারবে না। ওকে দিয়ে কিছু হবে না।

শুনে হক সাহেব বললেন, তা হলে তো ভালই হল হে, নৌকার পানি সেচার জন্যও তো একজন লোক চাই। মাঝে মাঝে নৌকার পানি না ফেললে নৌকা ডুবে যাবে না? তা হলে তো সবাই ডুবে মরব মাঝনদীতে; সেই জন্যই তো ওই পানি সেচার লোকটাকে আমার খুব দরকার। বঝলে?

তখন কি আর করা! হক সাহেবের কথাতেই শেষে সবাই ভোট দিয়ে সেই অকর্ম (?) লোকটাকেও নৌকায় তুলে নিল। লোকটা পাস করে গেল।

সেদিন কয়েকজন কর্ম একেবারে হতাশ হয়ে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল শেরেবাংলার কাছে। একেবারে সর্বনাশ হয়ে গেছে হুজুর'! আমাদের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেছে।

—কেন?

—উকিল, মোক্তার, ব্যারিস্টার সবাই আপনার উপর ভয়ানক খেপে গেছে। তারা কেউ আপনাকে ভোট দেবে না। তারপর দেশের জমিদার, জোতদার, মহাজন। এরা তো আগে থেকেই আপনার দুশমন।

হক সাহেব নির্বিকারভাবে বললেন, আমি ওদের ভোট চাই না। আমার দেশের কৃষক-প্রজা ভাইরা কী বলছে? তারা ঠিক আছে তো?

—তারা ঠিক আছে হুজুর।

—তা হলে ওদের মতো বড়লোকের ভোট না হলেও আমার চলবে। তারপর সত্যি সত্যি তা-ই হল। দেশের আদমজি, ইস্পাহানি, মহাজন, জমিদারদের সমর্থন হারিয়েও শেরেবাংলা বাংলাদেশের শুধু নিঃস্ব কৃষক শ্রমিকের সমর্থন নিয়েই নির্বাচনে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করলেন। তাঁর দল যুক্তফ্রন্ট লাভ করল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা, মুসলিম লীগের হল ভরাডুবি।

এই নির্বাচনে মোট ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে ২২৮টি লাভ করল যুক্তফ্রন্ট। শতকরা ৯৭টি ভোট যুক্তফ্রন্টের নৌকায় পড়ল। যুক্তফ্রন্ট ২২৮টি মুসলিম আসনের সবকটিতেই পাস করেছিল। মোট ৩০৯টি আসনের মধ্যে মাত্র

১০টি আসন পেল মুসলিম লীগ। যেন সারা দেশে শেরেবাংলার নেতৃত্বে ঘটে গেল একটি রক্তপাতহীন বিপ্লব।

কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, নির্বাচনে চরম সাফল্য এলেও শেষরক্ষা করা সম্ভব হল না শেরেবাংলার পক্ষে। চক্রান্তের জাল বিস্তার করে কেন্দ্রীয় চক্র অলক্ষে এসে হানল মরণ ছোবল।

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের বিজয় গোটা উপমহাদেশে এক বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু দেশের সাধারণ লোকেরা যাদের উপর এই বিপুল বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা জনগণের সেই অমূল্য বিশ্বাসের পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করতে পারে নি।

এই ব্যর্থতার জন্য যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত দলগুলোর দলীয় কোন্দল ও ক্ষমতার লড়াই অনেকাংশে দায়ী ছিল তা সত্যি কিন্তু তারও চেয়ে ছিল কেন্দ্রী চক্রান্ত।

যেমন—তিন দল তথা কৃষক শ্রমিক পার্টি, আওয়ামী লীগ আর নেজামে ইসলাম পার্টির সমন্বয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করেছে। এই বিজয়ের গৌরবের দাবিদার তিনটি দলই সমানভাবে মন্ত্রিসভা গঠনের সময় এই তিনটি দলের যে-কোন এক দলের নেতাই সর্বসম্মতভাবে। পার্লামেন্টারি দলের নেতারূপে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হয়ে মন্ত্রিপরিষদ গঠন করতে পারেন। তাই বিভিন্ন দল নিয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্টের নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকতার কথা বাদ দেয়া যায় না।

তাই বাইরে থেকে কেউ যদি এই আনুষ্ঠানিকতার পূর্বেই কাউকে আগাম নেতা বলে ঘোষণা করে তবে সে ক্ষেত্রে ভুল বাোঝাবুঝি সৃষ্টি হওয়ার যথেষ্ট অবকাশ থাকে।

এটা তৎকালীন মুসলিম লীগ খোদ কেন্দ্রীয় শাসক চক্রও জানত। তার জানত বলেই ফ্রন্টের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টির মাধ্যমে ভাঙ্গন ধরনের জন্যই নির্বাচনি ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পরপরই এবং শেরে বাংলা ফজলুল হককে

আনুষ্ঠানিকভাবে নেতা নির্বাচন করার আগেই তৎকালীন গভর্নর চৌধুরী খালেকুজ্জামান হক সাহেবকে মন্ত্রিসভা গঠনের আনুষ্ঠানিক আহবান জানালেন। যুক্তফ্রন্টের মধ্যে মতবিভেদ সৃষ্টি করাই ছিল এই আহবানের মুখ্য উদ্দেশ্য।

ফল এতে ভাল ফলল। ভুল বোঝাবুঝি কিছুটা সত্যিই সৃষ্টি হল। যুক্তফ্রন্টের অঙ্গিভূত অপর দলের কেউ কেউ প্রকাশ্যে না হলেও লুকিয়ে বলাবলি করতে লাগলেন এটা শেরেবাংলারই চালাকি। তিনি নেতা নির্বাচিত হবার জন্যই হয়তো সরকারের পক্ষ থেকে আগাম তাঁর নামটা ঘোষণা করিয়ে নিলেন। কিন্তু সত্যিকার অর্থে এই ধারণা ছিল একেবারেই ভ্রান্ত এবং অমূলক।

যা হোক, ভুলবোঝাবুঝি রোধ করার জন্যই গভর্নরের আমন্ত্রণ জানানো সত্ত্বেও রীতিমাফিক আগে আনুষ্ঠানিকভাবে ২ এপ্রিল ফজলুল হককে পার্লামেন্টারি দলের নেতা নির্বাচন করা হল।

এদিকে পরের দিন অর্থাৎ ৩ এপ্রিল রাত ১২টার মধ্যেই গভর্নরের কাছে মন্ত্রীপরিষদের সদস্যদের নাম পেশ করতে হবে। কিন্তু দলীয় কোন্দল শত চেষ্টা সত্ত্বেও উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পেতেই লাগল। শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত মন্ত্রিপরিষদের নামের পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরী করা সত্যি সম্ভব হল না। অন্যন্যোপায় হয়ে তিনি রাত ১২ টার সময় আসরাফ আলি চৌধুরী, আবু হোসেন সরকার এবং সৈয়দ আজিজুল হক (নান্না মিয়া)-এর নাম গভর্নরের কাছে পেশ করলেন।

বাইরের সাধারণ মানুষ ভেতরের এই কেন্দিলের কথা জানত না। পরের দিন পত্রিকাতে যখন তারা যুক্তফ্রন্টের অন্যতম প্রধান অঙ্গদল আওয়ামী লীগের সদস্যবর্জিত তিন সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রিসভার নাম দেখল। তখন তারা অবাক হয়ে গেল। অনেকের উৎসাহে ভাটা পড়ল। নির্বাচনে বিজয়ের পরমুহুর্তে পাড়ায় পাড়ায় যে উৎসবের সাড়া পড়ে গিয়েছিল তা থেমে গেল।

তারপর এভাবেই চলল মাসদেড়ক পর্দার অন্তরালে চলল দরকষাকষি,; মীমাংসারও চলল চেষ্টা। অবশেষে ১৫ মে (১৯৫৪) একটি আপস মীমাংসা সম্ভব

হল এবং ঐদিনই আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভায় যোগদান করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ও মোহন মিঞা মন্ত্রীর পদ লাভ করলেন।

কিন্তু তবু শেষরক্ষা হল না। কেন্দ্রীয় শাসকচক্র যেই দেখল প্রায় ভেঙে পড়া যুক্তফ্রন্ট আবার জোরদার হতে শুরু করেছে আমনি তাদের মাথা গেল বিগড়ে। শুরু হল নতুন করে চক্রান্তের জালবিস্তার।

শেরেবাংলা কোনকালে কোন বক্তৃতায় কলকাতার জনসভায় বা কার সঙ্গে সাক্ষাতে কী বলেছিলেন তা-ই নিয়ে শুরু হল লঙ্কাকাণ্ড। অতঃপর মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক এবং আর কয়েকজন মন্ত্রীকে ডেকে পাঠানো হলো করাচিতে। সেখানেও পেতে রাখা হল আরেক চক্রান্তের জাল।

করাচিতে অবস্থানকালে নগদ অর্থের বিনিময়ে নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় শেরেবাংলার আঞ্চলিক স্বাসত্ত্বশাসন শীর্ষক একটি খবরকে বিকৃত করে প্রকাশ করা হল। শেরে বাংলা এই প্রকাশিত খবরের প্রতিবাদ করলেও এই অপরাধেই কেন্দ্রীয় শাসকচক্র ষড়যন্ত্র পাকাতে লাগল এবং শেরেবাংলার মন্ত্রিসভা বাতিল করার চেষ্টা করতে লাগল। অবশেষে বিরক্ত হয়ে তিনি ২৮ তারিখের রাতে বিওএসি বিমানযোগে ঢাকা রওনা হলেন।

তিনি ঢাকায় ফিরে আসার পরপরই ৩০ মে বিকেল চারটায় মন্ত্রিসভা বাতিল করা হল এবং সারা দেশে ৯২-ক ধারা জারি করা হল।

অবশ্য এর আগেই তারা আরও একটি কুকর্ম সম্পন্ন করে নিলেন। ১৫ মে ঢাকার আদমজি জুট মিলে সুকৌশলে লাগানো হল শ্রমিক দাঙ্গা এবং এর উপর ভিত্তি করেই শাসন-ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলার অজুহাতে হক মন্ত্রিসভা বাতিল করে দেয়া হল।

ফজলুল হককে স্বগৃহে করা হল অন্তরীণ; সশস্ত্র পুলিশবাহিনী ঘিরে রাখল শেরেবাংলার বাড়ি। চারদিকে চলল ধরপাকড়। ২৪ ঘন্টার মধ্যে ঢাকা ও প্রদেশের বহু স্থান থেকে গ্রেফতার করা হল শত শত কর্মী। এঁদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরসহ ৩০জন পরিষদ সদস্যও ছিলেন। সারাদেশে করা হল ১৪৪ ধারা

জারি। তৎকালীন পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলি শেরেবাংলাকে ঘোষণা করলেন বিশ্বাসঘাতক বলে। হায় রে নির্মম উপহাস!

৬. অস্তাচলে মহাসূর্য

যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভার পতনের সঙ্গে সঙ্গেই বলতে গেলে শেরেবাংলার ও রাজনৈতিক জীবনের সমাপ্তি। জননেতা ফজলুল হকের জীবনের তখন প্রায় সায়াহ্নকাল। মনে নেই তেমন উৎসাহ, শরীরে বার্ধক্যের পদধ্বনি।

এরপর ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা ভেঙে গেলে মুসলিম লীগ প্রভাবিত একটি নতুন মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হল বটে, কিন্তু তিনি আর সেখানে যোগদান করলেন না। তিনি যোগদান করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায়। গ্রহণ করলেন কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পদ। প্রায় বছরখানেক অধিষ্ঠিত ছিলেন এই মন্ত্রি পদে।

এরপর ১৯৫৫ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র ঘোষণা করা হল। এই বছরই তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর নিযুক্ত হন।

কিন্তু এখানেও তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। অবশেষে ১৯৫৮ সালের ১ এপ্রিল তিনি গভর্নরের পদ থেকে অপসারিত হন। বলতে গেলে এটাই ছিল সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে শেরেবাংলার সর্বশেষ সম্পর্কচ্ছেদ। এ বছরেরই ২৭ অক্টোবর আয়ুব খান ক্ষমতা দখল করেন এবং দেশের সকলপ্রকার রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দিয়ে ঘোষণা করেন সামরিক আইন।

তখন শেরেবাংলার জীবনসূর্যও প্রায় আস্তাচলে ঢলে পড়েছে। এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি রাজনৈতিক জয় পরাজয়কে কেমন খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব নিয়ে গ্রহণ করতেন তা ভাবতে গেলে আজ বিস্মিত হতে হয়।

কোনো সম্মানিত সুউচ্চ পদ থেকে সহসা বিনা কারণে, বিনা দোষে অপসারিত হলে মানুষ স্বাভাবিক কারণেই মনে আঘাত পান, মানসিক দিক থেকে কিছুটা ভেঙে পড়েন এবং এসব অন্যায় কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দোষারূপ করেন। প্রতিবাদ জানান সরবে।

হক সাহেব যখন গভর্নরের পদ থেকে অপসারিত হন, তখন দেশে চলছিল এক ভয়াবহ কাণ্ড। সারা দেশে চলছিল বসন্ত মহামারী—দেশের লাখো লাখো মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছিল এই কালব্যাধিতে।

এই সময়েই তিনি ক্ষমতা হারালেন। গদিচ্যুতির পর থেকে শুভাকাঙ্ক্ষী এবং ভক্তরা তাকে সান্ত্বনা দিতে ছুটে এসেছিলেন; তিনি তাদের ডেকে বললেন, ক্ষমতার পাল্লা দিতে যারা বেহুঁশ, তারা তো চেয়েও দেখছে না, যাদের নিয়ে দেশ, তারা বসন্তের মহামারীতে কেমন করে অসহায়ভাবে মরে সাফ হয়ে যাচ্ছে। চলো, দলীয় রাজনীতি নয়, মহাজন মহারাজার সঙ্গে সংগ্রম নয়, এবার বসন্ত মহামারীর সঙ্গে সংগ্রামে মাতি। এসো সবাই দলাদলি ছেড়ে দেশের অসহায় মানুষগুলোকে বাঁচাতে একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

তারপর সিত্য তিনি তা-ই করলেন। তাঁরই উদ্যোগে, উৎসাহে আর চেষ্টায় কৃষক-শ্রমিক দল নিয়ে গঠিত হলপূর্ব পাকিস্তান সেবা সমিতি।

তাঁর উৎসাহে সাড়া দিয়ে দেশের অগণিত কৃষক-শ্রমিক আর স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল আর্তের সেবায়। দেশের বসন্তআক্রান্ত জেলাগুলোতে চলল ত্রাণ তৎপরতা। সরকারি সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়াই চলল এই সেবাকার্য।

১৯৫৮ সালে দেশে ঘোষণা করা হলো সামরিক শাসন। ইস্কানদার মির্জা দেশের শাসনতন্ত্র বাতিল ঘোষণা করলেন।

এ খবর শুনে কয়েকজন সাংবাদিক ছুটে এলেন তার কাছে। জানতে চাইলেন তার প্রতিক্রিয়া।

স্যার, এই নতুন পরিস্থিতিতে আমরা কোথায় রইলাম? একজন সাংবাদিক জানতে চাইলেন।

প্রশ্নের উত্তরে তিনি নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, যে তিমিরে ছিলাম, সেই তিমিরেই আছি।

শেরে বাংলার শেষ জীবনটা ছিল বড় নিঃসঙ্গ এবং দুঃখভারাক্রান্ত। যেন ঝড়ে বিধ্বস্ত এক বিরাট মহীরুহ। ধু-ধু প্রান্তরের বুকে একাকী দাঁড়িয়ে আছেন নিঃসঙ্গ— বিধ্বস্ত। এককালে তাঁর পত্র পল্লব শোভিত ছিল শাখা-প্রশাখায়। বিবর্ণ পত্ররা আজ ঝরে গেছে।

যে মানুষ একদিন দেশের অগণিত কৃষক-মজুর আর নিঃস্বজনের দুঃখমাোচনের জন্য নিজের সুখ বিসর্জন দিয়ে দিনরাত ছুটে বেরিয়েছেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। যার ব্যাঘ্র গর্জনে কোপে উঠেছে বাংলার অত্যাচারী জমিদার মহাজন বিত্তশালীদের হৃদয়— সেই শক্তিশালী ব্যাঘ্র নিজেই আজ নখদন্তহীন হয়ে পড়ে আছেন ঘরে। আগের সে শক্তিও নেই, সে সাহসও নেই।

জীবন সায়াহ্নে এসে শেরেবাংলা দেশের সবরকম রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকেই বিচ্ছিন্ন ছিলেন বলতে গেলে। তা ছাড়া সেকালের মুসলিম লীগ প্রভাবিত সরকারও তার প্রতি কোনো সুনজর দেয়নি। সুচিবার করেনি। শুধু দলীয় সংকীর্ণতার কারণেই মুসলিম লীগের নেতারাও, যারা এককালে এই মহাপুরুষেরই ছত্রছায়ায় থেকে এর পদতলে বসে রাজনীতি করেছেন, জীবনের নানা সুবিধা ও ক্ষমতা ভোগ করেছেন, তারা একবারও তাঁর দিকে ফিরে তাকাননি। জীবন-সায়াহ্নে এই যে একটি মানুষ সম্পূর্ণ অবহেলা, অযত্নে তিলে—তিলে শেষ প্রান্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, তার দিকে স্বাভাবিক সৌজন্যের খাতিরেও তাঁরা একবার ফিরে তাকাননি।

এ সময় শেরেবাংলা তার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে কতটা বেসামাল হয়ে পড়েছিলেন, তার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায় তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ও শেরেবাংলার সহচর ও ভক্ত জনাব মফিজউদ্দিন সাহেবের স্মৃতিকথা থেকে।

তিনি শেরেবাংলার জীবন-সায়াহ্নের কথা বলতে গিয়ে তার স্মৃতিচারণে লিখেছেন—

“১৯৬১-র ডিসেম্বর। হক সাহেবের জীবন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে তাঁর কথার খেই হারিয়ে যায়, তার অতীত জীবনের কীর্তি কাহিনী মনে করে কখনো হাসেন, আবার বর্তমান অবস্থা অনুভব করে তিনি কখনো কাঁদেন। কখনো বলেনঃ আমি চাখার যাব, মা-বাবার গোর জিয়ারত করব। সামান্য তরল খাদ্য তার সামনে আসে। তিনি বলেনঃ হাতীর খোরাক চাই কলার বাগান। এই সব খেয়ে তার প্রাণ বাঁচে?”

জনাব মফিজ উদ্দীন বলেছেন, “১৯৬২ সাল। হক সাহেব তখন তাঁর ঢাকার বাড়িতে। শুনতে পেলাম তাঁর শরীরটা ভাল যাচ্ছে না, মায়া লাগল। দেখতে গেলাম।

বিকেল ৰেলা। গিয়ে দেখি, তার ঘরের দক্ষিণ বারান্দায় একটা ইটে তৈরি হেলনা বেঞ্চিতে তিনি একা বসে আছেন। তার সামনে একটা ভাঙা টেবিল; পরনে লুঙ্গি, গায় পাঞ্জাবি, তার বোতাম খোলা।

কলজেটা চিড়িক দিয়ে উঠল। এই সেই মানুষ যাঁর কর্মজীবনের প্রতিটি মুহূর্ত মানুষে গমগাম করত?

সালাম জানালাম। কষ্টে চোখ মেলে জিজ্ঞাসা করলেনঃ কে তুমি? বললামঃ আমি মফিজউদ্দিন।

কোন মফিজউদ্দিন?

কুমিল্লার মফিজউদ্দিন।

বুঝেছি তুমি শিক্ষামন্ত্রী মফিজউদ্দিন।

হ্যাঁ, আপনার সেই খাদেম।

শোন মফিজউদ্দিন তুমি একবার আমাকে চাখার নিয়ে যেতে পার? মরবার আগে কলেজটা দেখে যাওয়ার জন্য পরাণটা বড় কাঁদে।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আপনাকে নিয়ে যেত পারব। কখন হুকুম হয় বলুন?

শরীরটা বড় দুর্বল মফিজউদ্দিন। কিছুদিন পরে এস. শরীরটায় একটু জোর হলেই যাব।

শুনেছি দু'তিনমাস আগে কেউ দেখতে এলে হক সাহেব তাকে বলতেন, আমাকে চাখার নিয়ে যেতে পার? আমি মা-বাপের কবর জিয়ারত করতে চাই। এবার দেখলাম, সে কবর জিয়ারতের বাসনা তাঁর চিন্তা থেকে দূরে সরে গেছে। সেখানে স্থান নিয়েছে চাখার কলেজ দেকার সাধ...

মাসেক কাল পর হক সাহেবের কাছে গেলাম, দেখলাম, সেদিনও তিনি সেই বারান্দায় একই অবস্থায় বসা, একইরূপ নিঃসঙ্গ। ছালাম জানালাম। আবার চোখের পাতা টেনে তুলে আমাকে দেখলেন, খুব খুশি হলেন। বললেন, শোন মফিজ, শরীরটায় তো জোর ফিরে এল না, কি করে তোমার সাথে চাখারে যাই?'

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর দুই দুই বার বিদায়ের এজাজত চাইলাম। দুবারই বললেনঃ 'বস. মিঞা আর একটু খানি বাস।'

আগে মানুষের ভিড়ে যিনি অহরহ হয়রান থাকতেন। আজ মানুষের অভাবে তিনি অহরহ হয়রান।...

কিছুদিন পর ফের হক সাহেবকে দেখতে গেলাম! এবার পেলাম আগের চেয়ে অনেকখানি দুর্বল।

দেখলাম মাতা-পিতার মাজার আর আপনি স্থাপিত কলেজ, কিছুই তাঁর চিন্তায় নেই। এবার তিনি বললেন, কেবল মানুযের কথাবার্তা, তার দেশের সেই চিরপ্রিয় সাধারণ মানুষ, যাদের কল্যাণ বিধানে তিনি জীবনভর ভেবেছেন, খেটেছেন, আল্লাহর দরগায় মোনাজাত করেছেন। কারও বিরুদ্ধে তিনি একটা অভিযোগের কথাও উচ্চারণ করলেন না। যেন সকল মানুষের কল্যাণ কামনার সম্বল কাঁধে নিয়ে তিনি মহাযাত্রা করছেন।

শেষে তাঁর শরীর এতো ভেঙে পড়ল যে তিনি আর বসেও থাকতে পারতেন না। তিনি পড়ে গেলেন শয্যায়। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এটাই তার অন্তিম শয়ান। তিনি আর এ রোগশয্যা থেকে উঠে দাঁড়াতে পারবেন না।'

শরীরে মাঝে মাঝে যখন অসহ্য ব্যথা হত, তিনি তখন নাকি প্রায়ই উপরের দিকে তাকিয়ে বলতেন, আল্লাহ রে, তুমি আমাকে তোর কাছে তুলে নে।

অবশেষে যেন আল্লাহ্ সত্যি সিত্য তাঁর অন্তিম আহ্বানে সাড়া দিলেন। ডাক এল পরপার থেকে।

শতাব্দীর মহীরুহ বাংলাদেশ-ভারতের রাজনৈতিক গগনের উজ্জ্বল নক্ষত্র সুদীর্ঘকাল দেদীপ্যমান থেকে অকস্মাৎ একদিন কক্ষচ্যুত হয়ে পড়লেন। বাংলার প্রান্তর, বাংলার বন্দর নগর, পল্লির আপামর মানুষের আশা-আকাঙ্খার মূর্ত প্রতীক-'মুকুটহীন বাদশা' শেরেবাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক বিগত অর্ধ শতাব্দীরও বেশি কাল ধরে ইতিহাসের অবিসংবাদিত মহানায়করূপে অধিষ্ঠিত থাকার পর ১৯৬২ সালের ২৭ এপ্রিল (শুক্রবার) সকাল ১০টা ৩৫ মিনিটে ৮৮ বছর ৫ মাস ২৮ দিন বয়সে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন।

শেরেবাংলার মৃত্যুর প্রায় একমাস আগেই তাঁর শরীর দারুণ রকম ভেঙে পড়েছিল। তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তাকে চিকিৎসার্থে ভর্তি করা হয়েছিল ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

তাঁর মৃত্যুর খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে বিরাট জনতা ভিড় করতে থাকে। হাসপাতাল থেকে তার লাশ তাঁর নিজস্ব কে. এম. দাস লেনস্থ বাসভবনে আনা হলে হাজার হাজার নরনারী সারাদিন তাদের প্রিয় নেতাকে শেষবারের মতো এক নজর দেখার জন্য ভিড় করতে থাকে। পরে তাঁর লাশ যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে ঢাকায় হাইকোর্ট প্রাঙ্গণের পশ্চিম পাশে সমাধিস্থ করা হয়।

তাঁর মৃত্যুতে কবি ফররুখ আহমদ বলেছেন,—

মৃত্যু যার প্রাণস্পর্শে প্রাণ পায়,
সে বীর মহান

মানব প্রেমিক সেই এ মাটিতে
নিয়েছে বিশ্রাম।
মাজারে ঘুমায় শের সংগ্রামের
শেষে, অনির্বাণ
মানুষের মনে জ্বলে তবু সেই
মানুষের নাম।
আল্লাহর রহমতে, ভেজা এ মাটিতে
করে আবিরাম
এখানে নতুন যাত্রী পায়
খুঁজে পথের সন্ধান!

সত্যি, শেরেবাংলার বিরাট ব্যক্তিত্ব ছিল আশ্চর্য উপাদানের বিস্ময়কর সংমিশ্রণ। এই ব্যক্তিত্বের একদিকে প্রতিভা, বুদ্ধি ও যুক্তি এবং অন্যদিকে আবেগ, উচ্ছ্বাস, সরলতা ও উদারতা। তার ব্যক্তি চরিত্রের অনেক ঘটনা অপূর্ব নাটকীয় এবং বিস্ময়করও।

বাংলাদেশের প্রকৃতি যেন এর সকল বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা নিয়ে তারই ব্যক্তিত্বে মূর্তি ধারণ করেছে। বাংলাদেশের এই অবারিত মাঠ, উদ্দাম নদনদী, উদার আকাশ এবং অপূর্ব শ্যামলিমায় যে মোহনীয়তা ও আবেগময়তা রয়েছে, তার সব কিছু যেন একত্রিত হয়ে শেরে বাংলারই ব্যক্তিত্বে আশ্রয় নিয়েছিল। বাংলাদেশের প্রকৃতিকে যদি কোন রসায়নাগারে পরিচালিত করে একটি মূর্তিদান করা যেত- তবে তাও হত তাঁরই প্রকৃতি।

দেশের এক ভাগ্যবিড়ম্বিত জনগোষ্ঠীকে তিনি সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবেসেছিলেন, আর তাদের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্যই তিনি নিয়োজিত করেছিলেন তার দীর্ঘ জীবনের সকল ফসল এবং শ্রেষ্ঠ সাধনা। তাঁর সাফল্য

এবং ব্যর্থতা দুই-ই হয়তো ইতিহাস স্মরণ রাখবে। কিন্তু পল্লি বাংলার নিম্নবিত্ত আর কৃষকসমাজে তার একটি মূর্তিই চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে।

শেরেবাংলা ফজলুল হক নিজেই নিজের তুলনা। যে কৃষক আজ লাঙলের ফলায় মাঠের কঠিন মাটি চাষ করছে, সে লাঙল চালাতে চালাতে বলবে- শেরেবাংলা নেই, হাটে এসে মাথার বোঝা নামিয়ে দিন মজুর বলবে— শেরে বাংলা নেই, পর্ণকুটিরে সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালিয়ে বার্ষীয়সী কৃষক বধু বলবে— শেরে বাংলা নেই, আর অসংখ্য মানুষের এই আক্ষেপ এবং অশ্রুতে জন্ম হবে এক অমর রূপকথা। ইতিহাস শেরেবাংলা সম্পর্কে কি বলবে— তা ইতিহাসই জানে। কিন্তু পল্লি বাংলার সরল-সহজ মানুষের প্রাণে একটি কাহিনীই চির অম্লান হয়ে থাকবে। তুমি যে ছিলে— সে যেন এক রূপকথা।”

তাঁর কথা বাংলার দুখি মানুষেরা কোনদিন ভুলবে না।